The Chittagong University Journal of Arts and Humanities
ISSN 1993-5536
VOL.XXXIV, 2018 (pp.57 - 80)
Published in October, 2023

কুরআন ও সুন্নাহ্‌র দৃষ্টিতে স্মৃতিবিজড়িত স্থানের সম্মান প্রদর্শনের বিধানঃ একটি পর্যালোচনা

ড. মুহাম্মদ নূরুল আমিন নূরী*

প্রতিপাদ্যসার

স্মৃতিবিজড়িত স্থানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন পূর্বেকার প্রত্যেক জাতির মধ্যে বিদ্যমান ছিল। যুগে যুগে নবী-রাসূল ও ইসলামের খালীফাগণ এর বিধান সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। স্মৃতিবিজড়িত স্থানের সম্মান প্রদর্শনের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর নীতিমালা এবং অন্যান্য ইসলামী আইনবিদগণের মতামত ও দিকনির্দেশনা এখানে আলোচনা করা হয়েছে। রাষ্ট্র যদি কেবলমাত্র পর্যটোন বা বাণ্যিজ্যিকভাবে চিন্তা করে স্মৃতিবিজড়িত স্থানের সংরক্ষণ করে কিংবা যথাযথ মর্যাদায় বহাল রাখতে চায় তবে এতে সাধারণভাবে কোনো অসুবিধা হবে না। তবে কুরআন ও সুন্নাহ্‌র আদলে এ বিষয়ে আমাদেরকে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। স্মৃতিবিজড়িত স্থানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে গিয়ে যদি ইসলামী শরীআতের কোনো বিধান নষ্ট হয় তাহলে এ থেকে বিরত থাকা উচিত। এই প্রবন্ধে পবিত্র কুরআন, সুন্নাহ্ ও ফিক্‌হের আলোকে স্মৃতিবিজড়িত স্থানসমূহ কেন্দ্রিক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নীতি, নিদর্শনাবলির প্রতি গুরুত্বারোপ করার ইতিহাস, স্মৃতিবিজড়িত স্থানের সম্মান প্রদর্শনের কারণসমূহ, ইসলামী আইনে স্মৃতিবিজড়িত স্থানের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের বিধান ও পরিণতি এবং স্মৃতিবিজড়িত স্থানসমূহের ব্যাপারে কিছু প্রস্তাবনা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হবে।

ভূমিকা

স্মৃতিবিজড়িত স্থানের সম্মান প্রদর্শন করা একটি প্রাচীন সংস্কৃতি। যা একেক জাতি একেক ভাবে করত। আর পরবর্তী যুগে অনেক রাষ্ট্র রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে তাদের ঐতিহাসিক নিদর্শনাবলি পুনরুজ্জীবিত করার প্রদেক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আবার জাতীয় অনেক সংস্থা এসব নিদর্শন রক্ষণা-বেক্ষণের জন্য তৎপর হয়ে উঠে এবং রাষ্ট্রসমূহকে এগুলোর প্রতি গুরুত্বারোপের জন্য আহবান করে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এবং সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর যুগে স্মৃতিবিজড়িত স্থানের সম্মানের কী নীতি ছিল এবং ‘উমর (রা.) ও অন্যান্য ইসলামী ব্যক্তিবর্গ জনগণকে এ বিষয়ে কি

* প্রফেসর, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

রকম দিকনির্দেশনা দিয়েছেন তা অত্র প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। স্মৃতিবিজড়িত স্থানের পরিচয়, এ প্রথা ছড়িয়ে পড়ার কারণসমূহ, এর পরিণতি, ইসলামী আইনে এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের শার'ঈ বিধান পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ্ এবং ফিক্হের আলোকে আলোচনা করাই হলো অত্র প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য।

স্মৃতিবিজড়িত শব্দের ইংরেজি প্রতি শব্দ হলো, vestige, ancient monument, antique, antiquities, relic, imprint, ruins, remnant, remains, trace, এথেকে উৎপত্তি হলো, archeology বা প্রত্নতত্ত্ব বিদ্যা।[১] পূর্ববর্তী জাতির বা নবী-রাসূলদের কিংবা আওলিয়ায়ে কিরামের যে কোনো স্মৃতিবিজড়িত বিষয়কে নিদর্শন বলে। কেউ কেউ বলেন, নিদর্শন বলতে, **علم الوثائق والمخلفات القديمة** "প্রামাণ্য চিত্র ও প্রবীণ স্মৃতিসমূহের জ্ঞান।"[২]

স্মৃতিবিজড়িত স্থানসমূহ কেন্দ্রিক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নীতি

স্মৃতিবিজড়িত স্থানসমূহের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অবস্থান কেমন ছিল তা নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

এক. নুবুওয়াতের পূর্বে ও পরে রাসূল ﷺ যেসব স্থান পরিদর্শন করেছেন, এগুলোর ব্যাপারে কোথাও সাব্যস্ত হয়নি যে, তিনি এগুলো যিয়ারত করতে বলেছেন কিংবা এগুলোর প্রতি গুরুত্বারোপ করতে উৎসাহ দিয়েছেন। এ ব্যাপারে শায়খুল ইসলাম ইবন তায়মিয়া (র.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নুবুওয়াত লাভের পর পূর্বে হেরা গুহায় কিংবা অন্যান্য স্থানে যেভাবে ধ্যানে মগ্ন থাকতেন এরূপ কোনো কিছু করেননি। নুবুওয়াতের পর তিনি ১৩ বছরের মত মক্কায় অবস্থান করেন। আর হিজরতের পরও 'উমরাতু কাদা, 'উমরাতুল জি'রানাহ্ ও মক্কা বিজয় উপলক্ষ্যে বিভিন্ন সময় মক্কায় এসেছিলেন। কিন্তু হেরা গুহায় আর কখনো যাননি। তাঁর সাহাবীগণও অনুরূপ কিছু করেননি।[৩] তিনি আরো বলেন, হজ্বের নিদর্শনাবলি তথা আরাফাত, মিনা ও মুযদালিফা ব্যতীত অন্যান্য স্থান ও পর্বতমালা যেমন হেরা পর্বত, মিনার পার্শ্ববর্তী পর্বত ইত্যাদি পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সুন্নাতের আওতাভুক্ত নয়।[৪]

দুই. রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কা বিজয়ের পর যখন পবিত্র কা'বা তাওয়াফ করলেন তখন কা'বার পার্শ্ববর্তী সকল মূর্তিকে ভেঙ্গে দিলেন। 'আব্দুল্লাহ্ ইবন মাসউদ (রা.)-এর বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেন,

دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ، وَحَوْلَ البَيْتِ سِتُّونَ وَثَلاَثُ مِائَةِ نُصُبٍ، فَجَعَلَ يَطْعُنُهَا بِعُودٍ فِي يَدِهِ، وَيَقُولُ: " ﴿جَاءَ الحَقُّ وَزَهَقَ البَاطِلُ، إِنَّ البَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾، ﴿جَاءَ الحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ البَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ﴾"

"মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কায় প্রবেশ করলেন, তখন কা'বা ঘরের চতুষ্পার্শ্বে তিনশ ষাটটি মূর্তি ছিল। তাঁর হাতের ছড়ি দিয়ে তিনি এগুলোকে ঠোকা দিতে লাগলেন এবং বলছিলেন, "সত্য এসেছে আর মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। মিথ্যা তো বিলুপ্ত হওয়ারই।"[৫] "বল, সত্য এসেছে আর অসত্য না পারে নতুন কিছু সৃষ্টি করতে এবং না পারে পুনরাবৃত্তি করতে[৬]।"[৭] এইসব মূর্তি ছিল

তৎকালীন যুগের অন্যতম নিদর্শন যেগুলোর প্রতি কাফিররা খুবই যত্ন নিত। সেজন্যই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এগুলোর প্রতি কোনো ভ্রুক্ষেপই করেননি। কিংবা এগুলো কোনো যাদুঘর ইত্যাদিতে সংরক্ষণ করেননি। সাহাবায়ে কিরাম আজীবন এই নীতির উপর চলেছেন। তারা আল্লাহ্‌র রাসূলের কথা ও কাজ তথা হাদীছের উপর অধিক গুরুত্ব দিতেন। যার জন্যই মাইলের পর মাইল সফর করতেন। হাদীছের প্রতি তারা এতবেশি গুরুত্ব দিতেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বৈবাহিক কর্মকাণ্ড, অযু, গোসল, পানাহার, নিদ্রা-জাগ্রত হওয়া প্রভৃতির আদব-কায়েদা পর্যন্ত বর্ণনা করতেন। কিন্তু তারা স্থান সম্পর্কিত কোনো নিদর্শনের প্রতি কখনো গুরুত্বারোপ করেননি কিংবা এর উপর পাকা ঘর নির্মাণ করেননি।

শায়খ আব্দুল আযীয ইবন বায (র.) বলেন, "এটা সবার জানা বিষয় যে, নবী কারীম ﷺ-এর সাহাবীগণ আল্লাহ্‌র দ্বীন সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর অধিক প্রিয়ভাজন ছিলেন। তারা এইসব নিদর্শনাবলিকে পুনরুজ্জীবিত করেননি এবং সম্মানও প্রদর্শন করেননি। যদি এগুলো পুনরুজ্জীবিত করা বা এগুলো পরিদর্শন করা সাওয়াবের কাজ হত তাহলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কায় কিংবা হিজরতের পর এইসব কাজ করতেন এবং অন্যকেও করার নির্দেশ প্রদান করতেন এবং পরবর্তীতে সাহাবায়ে কিরামও এইসব কাজ করতেন ও এগুলোর প্রতি মানুষকে পথ দেখাতেন।[৮]

এই যুক্তির পক্ষে দলীল নিম্নরূপ

১. মক্কা, মদীনা ও বায়তুল মুকাদ্দাসে অবস্থিত নিদর্শনসমূহের ব্যাপারে তাদের অবস্থান

এ বিষয়ে কোনো প্রমাণ নেই যে, সাহাবায়ে কিরামের কেউ এগুলো পরিদর্শন করেছেন অথবা এগুলো অনুসরণ করেছেন কিংবা এগুলো সংরক্ষণের নির্দেশ দিয়েছেন। বরং তারা এগুলোর পথ বন্ধ করে দিয়েছেন। মুসলমানরা যখন 'তুসতার' বিজয় করেছিলেন, তখন সেখানে একজন মৃতব্যক্তির একটি খাট পেয়েছিল। বলা হয়ে থাকে এটা 'দানিয়াল'-এর খাট এবং তারা সেখানে একটি পুস্তক পেয়েছিল, যেখানে বিভিন্ন ঘটনা পরিক্রমার আলোচনা ছিল। আর সেই এলাকার লোকজন এটার ওয়াসীলায় বৃষ্টি প্রার্থনা করত। আবূ মূসা আশ'আরী (রা.) এ ব্যাপারে পরামর্শ চেয়ে উমর (রা.)-এর নিকট চিঠি লিখলেন। অতঃপর উমর (রা.) উত্তরে লিখলেন, "দিনের বেলায় তেরটি কবর কুড়বে, এরপর রাতের বেলায় কোনো একটি কবরে সেটা দাফন করে সকল কবরের চিহ্ন মুছে দিবে। যেন মানুষ এটাকে কেন্দ্র করে ফিতনায় পতিত না হয়।"[৯]

এজন্য শায়খুল ইসলাম ইবন তায়মিয়া (র.) বলেন, সাহাবায়ে কিরাম মানুষ ফিতনায় পড়ে যাওয়ার ভয়ে নবীগণের কোনো কবরের চিহ্নও রাখেননি কিংবা এগুলোকে কেন্দ্র করে কোনো সফরও করেননি। বরং আমাদের নবীর কবরকেও তারা কক্ষের মধ্যে বেষ্টিত করে রেখেছিলেন। আর মানুষকে যথাসম্ভব এখান থেকে বারণ করে রেখেছিলেন। আর অন্যান্য কবরগুলো যথাসম্ভব মুছে দিয়েছিলেন। এটা হচ্ছে ফিতনার আশঙ্কা থাকলে। আর যদি ফিতনার আশঙ্কা না থাকে তাহলে কবরের চিহ্ন থাকাতে কোনো অসুবিধা নেই।[১০]

আর কখনো কখনো এসব নিদর্শনাবলি পরিদর্শনের উপলক্ষ আসলেও তারা তখনও এগুলো পরিদর্শন করতেন না। যেমন উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) ও তাঁর ছেলে আব্দুল্লাহ্ ﷺ-এর ক্ষেত্রে ঘটেছে। যখন তারা বায়তুল মুকাদ্দাস যিয়ারাত করতে এসেছিলেন, তখন তারা সেখানকার ঐতিহাসিক পাথর কিংবা অন্যান্য স্থান পরিদর্শন করেননি।[১১] বরং ফিতনার আশঙ্কা থাকলে তারা এগুলো নিশ্চিহ্ন করার নির্দেশ প্রদান করতেন। যেমন উমর (রা.) যে গাছের নিচে 'বাই'আতুর রিদ্ওয়ান' (হুদায়বিয়ার সন্ধির পূর্বে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাহাবায়ে কিরামকে নিয়ে যে বাই'আত গ্রহণ করেছিলেন তাই বাই'আতুর রিদওয়ান) সংঘটিত হয়েছিল, সেই গাছটি কেটে ফেলার নির্দেশ প্রদান করেছিলেন।[১২]

২. মিশরের পিরামিড প্রসঙ্গ

ইতিহাসের কোথাও উল্লেখ নেই যে, 'আমর ইবনুল 'আস (রা.)-এর নেতৃত্বে মিশর বিজয়ের বিজয়ী কোনো সাহাবী মিশরের পিরামিড দেখতে গেছেন; এগুলোর প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ তো দূরের কথা; অথচ এই পিরামিডগুলো পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্যের একটি। ইলমুদ দ্বীন অর্জনের জন্য বহু আলিম মিশরে গেছেন; কিন্তু তাঁরা এই সব নিদর্শন পরিদর্শনে গেছেন বলে কোনো বর্ণনা পাওয়া যায়নি; এগুলোর প্রতি গুরুত্বারোপ করা তো দূরের কথা। যেমন ইমাম শাফি'ঈ (র.), ইয্য ইবন আব্দিস সালাম (র.), ইবন খুযায়মা (র.) এবং আবূ হাতিম (র.) প্রমুখ। ইমাম যারকালী (র.)-কে মিশরের পিরাপিড ইত্যাদি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, "সাহাবীগণ যারা মিশরে প্রবেশ করেছিল তারা কি এগুলো দেখতে গেছেন? তিনি বলেন, এগুলো তৎকালে বালুছাপা ছিল। আর এইসব স্থাপনার অধিকাংশই পরবর্তীতে আবিস্কার হয়েছে।[১৩] যা প্রমাণ বহন করে যে, এগুলো ছিল মূল্যহীন বস্তু। এভাবে সকল স্থাপনা ও নিদর্শনাবলির ব্যাপারে একই হুকুম। ইবন খালদূন (র.) বলেন, বাদশাহ হারুনুর রাশীদ (র.) কিসরার সেই ঐতিহ্যবাহি রাজ প্রসাদও ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছিলেন। যাতে পরবর্তীতে এদের বংশধর এ নিয়ে গর্ভবোধ না করে বা পূজার স্থান বানিয়ে না ফেলে।[১৪]

নিদর্শনাবলির প্রতি গুরুত্বারোপ করার ইতিহাস

এটা জানা বিষয় যে, পাশ্চাত্যের দেশগুলোই মুসলিম বিশ্বে তাদের অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্যই এসব নিদর্শনের প্রতি গুরুত্বারোপের প্রতি উৎসাহিত করে। যেমন 'জুব'[১৫] স্পষ্টভাবেই বলেছেন, মুসলিম বিশ্বের অমুসলিমদের অন্যতম লক্ষ হচ্ছে, সেখানকার প্রাচীন সভ্যতাগুলোকে পুনরুজ্জীবিত করা। আর এ জাতীয় গুরুত্বারোপের দৃশ্য আমরা দেখতে পাই তুরস্ক, মিশর, ইন্দোনেশিয়া, ইরাক ও পারস্যে।[১৬]

এই সকল স্বীকারোক্তিটা এটাই প্রমাণ করে যে, পাশ্চাত্যরা মুসলিম শাসনব্যবস্থার প্রতিটির দিকে জবরদখলের মনোভাব নিয়ে কাজ করে। তারা মুসলমানদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টিকারী বিভিন্ন কর্মকাণ্ড সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। যেমন, মুসলমানদের ধর্মীয় উৎসব ছাড়া বিভিন্ন স্থানীয় উৎসবের সৃষ্টি করা। যেগুলো পালন করার জন্য তাদেরকে উৎসাহিত করা হয়। তাদের জন্য বিশেষ পোশাকের

ব্যবস্থা করা হয়। আর মুসলমানরা যে একভাষা এক দ্বীনের উপর অটল ছিলেন তাতে তারা বিভিন্নভাবে ফাটল ধরাতে অনেকটা সক্ষম হয়েছে। আর এটা করেছে তারা ইরাক, সিরিয়া, লেবানন, জর্ডান ও মিশরে; যা তাদের প্রাচীন সভ্যতা ও জাতীয়তাবাদকে উস্কে দেয়।

এই ব্যাপারে শায়খ সালিহ ফাওযান (র.) বলেন, "প্রাচীন স্মৃতিবিজড়িত স্থানের পুনরুজ্জীবিত করা এগুলো মূলত শত্রুদের চক্রান্ত, যাতে মুসলমানরা এগুলোর পিছনে পড়ে তাদের ইতিহাস-ঐতিহ্য ও ইসলামী সভ্যতাকে ভুলে যায়। না হয়, মুসলমানগণ প্রয়োজনীয় সৃজনশীল কাজ বাদ দিয়ে ধ্বংস হয়ে যাওয়া এসব রীতি-নীতি, খেলা-ধূলা ও ঘর-বাড়ীর পিছনে তাদের মূল্যবান সময় ব্যয় করার কী অর্থ থাকতে পারে? শত্রুরা মুসলমানদেরকে চতুর্দিক হতে এইসব কুসংস্কারের জালে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এমতাবস্থায় মুসলমানদের উচিৎ তাদের দ্বীনের দিকে ফিরে যাওয়া ও নবীর সুন্নাতকে পুনরুজ্জীবিত করা এবং সালফে সালিহীনের সীরাত, নীতি, আদর্শ ও ঐতিহ্যকে আকড়ে ধরা এবং এগুলো নিয়ে গবেষণা করা।"[১৭] মূলত এসমস্ত নিদর্শনের পিছনে গবেষণা করার মধ্যে কোনো লাভ নেই। বরং এতে করে সময় ও সম্পদের অপব্যবহার এবং ফলাফল ছাড়া বিনিয়োগ করার নামান্তর। বরং অনেক সময় এগুলো মূর্তিপূজা ও জাহিলী কুসংস্কারের দিকে নিয়ে যাওয়ার সমূহসম্ভাবনা বেশি।

স্মৃতিবিজড়িত স্থানের সম্মান প্রদর্শনের কারণসমূহ

আল্লাহ্ তা'আলা নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন এবং যে উদ্দেশ্যে মানুষ সৃষ্টি করেছেন তার বিস্তারিত বিবরণ সম্বলিত কিতাবাদিও তাদের উপর নাযিল করেছেন। সেই মহান উদ্দেশ্যেটা হলো, একত্ববাদের আদেশ ও শিরক থেকে নিষেধ। কিন্তু উম্মতের সাথে নুবুওয়াতী যুগের দূরত্ব যতটা বাড়তে লাগল ততই তাদের মধ্যে শিরকী কর্মকাণ্ড, বিদ'আত ও কুসংস্কার বৃদ্ধি পেতে লাগল। বিষয়টা যখন এরূপ অবস্থায় দাঁড়াল তখন এর কারণসমূহ নির্ণয় করা আবশ্যক হয়ে পড়ল। যেহেতু রুগের কারণ নির্ণয় করা গেলেই এর সুচিকিৎসা করা সম্ভব। নিম্নে মৌলিক কারণসমূহ পর্যায়ক্রমে বর্ণনা করা হলো।

১. সম্মান প্রদর্শনে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি

সম্মান প্রদর্শনে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করা এই ফিতনা প্রসারের অন্যতম কারণ। পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ্‌র অনেক জায়গায় আকীদা ও 'ইবাদত উভয় ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে এই মাহামারী থেকে সতর্ক করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ﴿يَاأَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ﴾। "হে আহলে কিতাবগণ! তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না এবং আল্লাহর শানে নিতান্ত সঙ্গত বিষয় ছাড়া কোনো কথা বলো না।"[১৮] তিনি আরও বলেন, ﴿قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ﴾ "বলুন, হে আহলে কিতাবগণ, তোমরা স্বীয় ধর্মে অন্যায় বাড়াবাড়ি করো না এবং এতে ঐ সম্প্রদায়ের প্রবৃত্তির

অনুসরণ করো না, যারা পূর্বে পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে। তারা সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে"।[১৯]
এই দুই আয়াতে যদিও আহলে কিতাবকে সম্বোধন করা হয়েছে কিন্তু হুকুমের দিক দিয়ে উম্মাতে মুহাম্মাদীও এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কারণ, অত্র আয়াতে উম্মতে মুহাম্মদীকে আহলে কিতাবের পথ ও পন্থাকে অনুসরণ করতে নিষেধ করা হয়েছ।[২০]

ফাদাল ইবন 'আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীছে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, "وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ." "দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা থেকে তোমরা বিরত থাকবে। কারণ, দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ির কারণেই তোমাদের পূর্ববর্তীরা ধ্বংস হয়ে গেছে।"[২১]
ইবন তায়মিয়া (র.) বলেন, দুটি কারণে মানুষের মধ্যে শিরক ছড়িয়ে পড়েছে।
এক. নেককার লোকদের কবরের প্রতি অতি ভক্তি করার কারণে,
দুই. বরকত নেয়ার দোহাই দিয়ে তাদের কবরের উপর মাযার নির্মাণের কারণে।[২২]

এই দুইটি ফিতনার প্রতি ইঙ্গিত করে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, "আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ، ذَكَرَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَنِيسَةً رَأَتْهَا بِأَرْضِ الحَبَشَةِ يُقَالُ لَهَا مَارِيَةُ، فَذَكَرَتْ لَهُ مَا رَأَتْ فِيهَا مِنَ الصُّوَرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أُولَئِكَ قَوْمٌ إِذَا مَاتَ فِيهِمُ العَبْدُ الصَّالِحُ، أَوِ الرَّجُلُ الصَّالِحُ، بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ، أُولَئِكَ شِرَارُ الخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ."

"উম্মে সালামা (রা.) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে তাঁর হাবশায় দেখা 'মারিয়া' নামক একটি গির্জার কথা উল্লেখ করলেন। তিনি সেখানে যে সব প্রতিচ্ছবি দেখেছিলেন, সেগুলোর বর্ণনা দিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, এরা এমন সম্প্রদায়, যাদের মধ্যে কোনো সৎ বান্দা অথবা বলেছেন কোনো সৎ লোক মারা গেলে তার কবরের উপর তারা মসজিদ বানিয়ে নিত। আর তাতে ঐ সব ব্যক্তির প্রতিচ্ছবি স্থাপন করতো। এরা আল্লাহ্র কাছে নিকৃষ্টতম সৃষ্টি।"[২৩] এটিই ছিল মূলত 'লাত' নামক মূর্তিকে পূজার মূল কারণ।

ইবন 'আব্বাস (রা.) ও মুজাহিদ (র.) অত্র আয়াত ﴿أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى﴾ "তোমরা কি ভেবে দেখেছো 'লাত' ও 'উয্যা' সম্বন্ধে'[২৪] -এর ব্যাখ্যায় বলেন, 'লাত' একজন সৎলোক ছিল। হজ্বের মৌসুমে সে হাজীদেরকে পানির সাথে ছাতু মিশিয়ে পান করাতো। তার মৃত্যুর পর জনগণ তার কবরের খিদমত করতে শুরু করে এবং ধীরে ধীরে তার 'ইবাদতের প্রচলন শুরু হয়।[২৫] ইবন কাছীর (র.) বলেন, 'লাত' ছিল একটি সাদা পাথর যা অংকিত ও নক্সাকৃত ছিল। এর উপর গম্বুজ নির্মাণ করা হয়েছিল। এর উপর তারা গেলাফ উঠিয়েছিল। এর জন্যে তারা খাদেম, রক্ষক, ও ঝাড়ুদার নিযুক্ত করেছিল। এর আশে পাশের জায়গাগুলোকে তারা হারাম শরীফের মত মর্যাদা সম্পন্ন মনে করতো। এটা ছিল তায়েফবাসীদের মূর্তির ঘর বা মন্দির। আর 'উয্যা' হলো, মক্কা ও মদীনার

মধ্যস্থলে অবস্থিত 'নাখলা' নামক স্থানে একটি বৃক্ষের নাম। এর উপর গম্বুজ নির্মিত ছিল। ওটাকেও চাদর দ্বারা আবৃত করা হতো। কুরায়েশরা ওর খুবই সম্মান করতো ও পূজা করতো।[২৬]

সর্বপ্রথম পুণ্যবান ব্যক্তিদের প্রতিমূর্তি তৈরি করে শিরকের প্রবর্তন শুরু হয়েছে হযরত নূহ (আ.)-এর সম্প্রদায়ের মধ্যে।[২৭] ইবন 'আব্বাস (রা.) বলেন,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، "صَارَتِ الأَوْثَانُ الَّتِي كَانَتْ فِي قَوْمِ نُوحٍ فِي العَرَبِ بَعْدُ أَمَّا وَدٌّ كَانَتْ لِكَلْبٍ بِدَوْمَةِ الجَنْدَلِ، وَأَمَّا سُوَاعٌ كَانَتْ لِهُذَيْلٍ، وَأَمَّا يَغُوثُ فَكَانَتْ لِمُرَادٍ، ثُمَّ لِبَنِي غُطَيْفٍ بِالجُوْفِ، عِنْدَ سَبَإٍ، وَأَمَّا يَعُوقُ فَكَانَتْ لِهَمْدَانَ، وَأَمَّا نَسْرٌ فَكَانَتْ لِحِمْيَرَ لِآلِ ذِي الكَلاَعِ، أَسْمَاءُ رِجَالٍ صَالِحِينَ مِنْ قَوْمِ نُوحٍ، فَلَمَّا هَلَكُوا أَوْحَى الشَّيْطَانُ إِلَى قَوْمِهِمْ، أَنِ انْصِبُوا إِلَى مَجَالِسِهِمُ الَّتِي كَانُوا يَجْلِسُونَ أَنْصَابًا وَسَمُّوهَا بِأَسْمَائِهِمْ، فَفَعَلُوا، فَلَمْ تُعْبَدْ، حَتَّى إِذَا هَلَكَ أُولَئِكَ وَتَنَسَّخَ العِلْمُ عُبِدَتْ".

হযরত নূহ (আ.)-এর যুগের প্রতিমাগুলোকে আরবের কাফিররা গ্রহণ করেছে। দুমাতুল জানদালে কালব গোত্র 'ওয়াদ' প্রতিমার পূজা করতো। হুযায়েল গোত্র পূজা করতো 'সুওয়া' নামক প্রতিমার। মুরাদ গোত্র এবং সাবা শহরের নিকটবর্তী জারফ নামক স্থানের অদিবাসী বানু গাতীফ গোত্র 'ইয়াগূছ' নামক প্রতিমার উপাসনা করতো। হামাদান গোত্র 'ইয়াউক' নামক প্রতিমার পূজারী ছিল এবং যীলকালা' গোত্র হুমাইর 'নাসার' নামক প্রতিমার পূজা করতো। প্রকৃতপক্ষে এগুলো হযরত নূহ (আ.)-এর কওমের সৎ লোকদের নাম ছিল। তাঁদের মৃত্যুর পর শয়তান ঐ যুগের লোকদের মনে এই খেয়াল জাগিয়ে তুললো যে, ঐ সৎ লোকদের উপাসনালয়ে তাঁদের স্মারক হিসেবে কোনো নিদর্শন স্থাপন করা উচিত। তাই তারা তথায় কয়েকটি নিশান স্থাপন করে প্রত্যেকের নামে নামে ওগুলোকে প্রসিদ্ধ করে। তারা জীবিত থাকা পর্যন্ত ঐ সৎলোকদের পূজা হয়নি বটে, কিন্তু তাদের মৃত্যুর পর ও ইলম উঠে যাওয়ার পর যে লোকগুলোর আগমন ঘটে তারা অজ্ঞতা বশতঃ ঐ জায়গাগুলোর ও ঐ নামগুলোর নিদর্শনসমূহের পূজা শুরু করে দেয়।[২৮] সুস্পষ্ট হলো, মূর্তিপূজার মূল কারণ হলো, পুণ্যবান লোকদের সম্মান প্রদর্শনে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করা।

২. সম্পদ উপার্জন ও মানুষের মধ্যে নিজেদের মান-মর্যাদা বৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষা

আম্বিয়ায়ে কিরাম এবং পুণ্যবানদের স্মৃতিবিজড়িত স্থানের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের আরেকটি অন্যতম কারণ হলো, সম্পদ উপার্জন ও মানুষের মধ্যে নিজেদের মান-মর্যাদা বৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষা। যেমন আব্দুল কুদ্দুস আনসারী (র.) বলেন, মসজিদে বনী জাফরে নবী কারীম ﷺ যেই পাথরে বসতেন বলে লোকমুখে কথিত আছে, তিনি সেই পাথরকে মিশরের 'দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যাতে' সুউচ্চ কাঁচের কোষাগারে সংরক্ষিত অবস্থায় দেখতে পান। তথাকার প্রধান পরিচালককে এই ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি উত্তরে বলেন,"মদীনার এক লোক এই পাথরটি মিশরে নিয়ে এসে নবী ﷺ এই পাথরে বসতেন বলে প্রচার করে মোটা অংকের টাকা দিয়ে বিক্রি করছে।"[২৯] অনেক সময় দেখা যায় যে, চক্রান্তকারীদের একদল কবরের পার্শ্বে বসে থাকেন এবং মানুষের মধ্যে এই

মৃতব্যক্তি সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার মিথ্যা কারামাতের কথা প্রচার করে, যেন তারা এই কবরের জন্যে মান্নাত করে, টাকা খরচ করে এবং গরু-ছাগল কুরবানী করে। উদ্দেশ্য হলো এরই মাধ্যমে মানুষের নিকট থেকে সম্পদ উপার্জন করা ইত্যাদি। তারা এই কবরকে ঘিরে অনেক ভুল তথ্য মানুষকে দেয়, যেন কবরের প্রতি তাদের ভক্তি বেড়ে যায়। কবরে বিভিন্ন ধরনের খুশবো, আগরবাতি, মশাল প্রজ্বলিত করে রাখে এবং ভক্তদের জমানোর জন্য কবর কেন্দ্রিক বার্ষিক ওরস ইত্যাদিরও ব্যবস্থা করে। সেই সময় সাধারণ মানুষ দেখতে পায় যে, কবরে মানুষ ভিড় জমাচ্ছে, কবরের পাথরকে স্পর্শ করে বরকত নিচ্ছে। কবরে শায়িত ব্যক্তির নিকট সাহায্য ও প্রার্থনা করছে এবং তার নামে কোরবানী করছে। ফলে সাধারণ মানুষও এদিকে ধাবিত হচ্ছে এবং কবরের নামে বিভিন্ন প্রকার খরচ করছে ও পূজা করা আরম্ভ করছে।

৩. দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞতা

নুবুওয়াতের পূর্বে মানুষ ছিল দ্বীন সম্পর্কে অন্ধ। মূর্তিপূজা ও কুসংস্কারের অন্ধকারে নিমজ্জীত ছিল। এক সময় তাদের কাছে শেষ নবী মুহাম্মদ ﷺ আসলেন, তাদেরকে কিতাব ও প্রজ্ঞা শিক্ষা দিলেন এবং অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসলেন। তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দিলেন এবং তাদের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করলেন। এই কথাই আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেন, ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ "আল্লাহ্ ঈমানদারদের উপর অনুগ্রহ করেছেন যে, তাদের মাঝে তাদের নিজেদের মধ্য থেকে নবী পাঠিয়েছেন। তিনি তাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করেন। তাদেরকে পরিশোধন করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও কাজের কথা শিক্ষা দেন। বস্তুত তারা ছিল পূর্ব থেকেই পথভ্রষ্ট।"[৩০]

এভাবে আল্লাহ্র রাসূল ﷺ মানুষের নিকট দ্বীনের বার্তাটি পূর্ণরূপে ও সঠিকভাবে পৌঁছে দিলেন এবং তাদেরকে একটি সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর রেখে গেলেন। এরপর সাহাবায়ে কিরাম এই দ্বীনের প্রচারের কাজ করে গেছেন। অতঃপর প্রজন্মের পর প্রজন্ম এই কাজটি করে আসতে লাগলেন। কিন্তু সময় যতই সামনের দিকে আসতে লাগল ততই মানুষের মাঝে আবার দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞতা বৃদ্ধি পেতে লাগল। আর শুধু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এই কথাটিরই সত্যায়ন করেছেন, "يُقْبَضُ العِلْمُ، وَيَظْهَرُ الجَهْلُ وَالفِتَنُ." "ইলম তুলে নেওয়া হবে, অজ্ঞতা ও ফিতনার প্রসার ঘটবে।"[৩১] আর বাস্তবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যা বলেছেন তাই ঘটেছে। আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাঁরই প্রেরিত রাসূল ও তাদের মিশন সম্পর্কে যখন মানুষ অজ্ঞতায় পড়ে রয়েছে, তখনই শয়তান তাদেরকে ফিতনার প্রতি আহবান করা আরম্ভ করলো। অথচ তাদের নিকট ঐ পরিমাণ জ্ঞান নেই, যার মাধ্যমে তার দাওয়াতকে ফিরিয়ে দিতে পারেন। ফলে অজ্ঞতা পরিমাণ তার আহবানে ছাড়া দিয়েছে এবং তাদের নিকট বিদ্যমান জ্ঞান অনুযায়ী তার ধোঁকা থেকে বেঁচে রয়েছে।[৩২]

ইবনুল কায়্যিম (র.) বলেন, "অজ্ঞতা বিস্তার লাভ করায় ও জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে অধিকাংশ লোকদের উপর শিরক প্রাধান্য বিস্তার লাভ করেছে। ফলে তাদের নিকট ভাল বিষয় খারাপ বিষয়ে

পরিণত হলো এবং খারাপ বিষয় ভাল মনে হতে লাগল। সুন্নাতকে বিদ'আত এবং বিদ'আতকে সুন্নাত মনে করতে লাগল। এমনকি জ্ঞানী ব্যক্তিদের লোপ পেতে লাগল, অজ্ঞলোক বৃদ্ধি পেতে লাগল এবং ইসলাম অপরিচিত হয়ে রইলো। এ ধারণার উপরই ছোটরা বড় হতে লাগল এবং বড়রা বার্ধ্যকে পৌঁছতে রইলো।"[৩৩]

ইবনুল জাওযী (র.) বলেন, "শয়তান মানুষের কাছে প্রবেশ করার সবচেয়ে বড় দরজা হলো অজ্ঞতা। সে এই দরজা দিয়ে জাহিলদের নিকট খুবই নিরাপদে প্রবেশ করে। কিন্তু জ্ঞানীর নিকট সে চুরি করেই প্রবেশ করে।"[৩৪] কারাফী (র.) বলেন, দুনিয়া ও আখিরাতের সমস্ত ফসাদের মূল হলো, অজ্ঞতা। তা সাধ্যমত নিজ থেকে দূরীভূত করার চেষ্টা কর। আর ইহকাল ও পরকালের সমস্ত কল্যাণের মূল হলো জ্ঞান। সুতরাং শক্তি সাধ্যমতে তা অর্জন করার চেষ্টা করতে থাক।[৩৫]

মূলত এই অজ্ঞতা সৃষ্টি হয় দুটি বিষয় থেকে,

এক. কুরআন ও হাদীছ শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষা প্রদান থেতে বিরত থাকা এবং উভয়ের উপর চিন্তা না করা। যে ব্যক্তি সুন্নাত থেকে বিমুখ হবে সেতো বিদ'আতে লিপ্ত হয়ে যাবে। মূলত যে ব্যক্তি অন্তর দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলার কালাম শ্রবণ করবে এবং এর উপর চিন্তা-গবেষণা করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে শয়তানের কুমন্ত্রণতা তথা 'ইবাদত বিমুখতা ও নিফাকী থেকে রক্ষা করবে। এভাবে যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর হাদীছের পূর্ণ অনুসরণ করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে বিদ'আত ও মনগড়া মতবাদ থেকে হিফাযত করবে।[৩৬]

দুই. কুরআন ও সুন্নাহ্র অপব্যাখ্যা করা। অর্থাৎ এটা মনে করা যে, কুরআন ও সুন্নাহ্তে যেসব বিষয় আলোচনা করা হয়েছে এগুলো পূর্ববর্তীদের জন্য নির্দিষ্ট। বর্তমানকার লোকদের সাথে এগুলোর কোনো সম্পর্ক নেই। 'উমর (রা.) বলেন, "إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية" "নিশ্চয় ইসলামের শক্তি ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে চলবে, যখন ইসলামে এমন লোকের জন্ম হবে যারা অজ্ঞতাকে বুঝতে পারে না।[৩৭]

আব্দুল লাতীফ ইবন্ আব্দির রহমান ইবন্ হাসান আল-শায়খ (র.) বলেন, আল্লাহ্র কিতাবের সঠিক অনুধাবনের ক্ষেত্রে একটি প্রতিবন্ধকতা হলো, তারা ধারণা করেছে যে, মুশরিকদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে যা বলেছেন এবং তাদের যেসব স্বভাবের কথা উল্লেখ করেছেন, তা তৎকালীন মুশরিকদের সাথে সম্পৃক্ত। এগুলোর সাথে বর্তমান মানুষের কোনো সম্পর্ক নেই। কখনো কখনো তাফসীরবিশারদগণের কথা, এই আয়াতটি অমুখ মূর্তিপূজারীদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে বা এটি খ্রিস্টানদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে, অথবা ঐটি ধর্মত্যাগীদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে ইত্যাদি এইসব কথাগুলোকে তারা কেবল তৎকালীন মানুষদের সাথেই সম্পৃক্ত এবং এর হুকুম সবার জন্যে ব্যাপক নয় বলেই মনে করেছে। এ রকম অপব্যাখ্যা মানুষের জন্য কুরআন ও সুন্নাহ্ বুঝার ক্ষেত্রে বড় একটি প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে।[৩৮]

৪. ভ্রান্ত ধর্মের অনুসারীদের দ্বারা প্রভাবিত হওয়া

স্মৃতিবিজড়িত স্থানের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের ফিতনা প্রসারিত হওয়ার আরেকটি অন্যতম কারণ হলো, ইয়াহুদী, খ্রিস্টান ও অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদের সাথে ওতপ্রোতভাবে মুসলমানদের মিশে যাওয়া। কারণ কবরপূজার প্রচলন ছিল ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদের মাঝে। খ্রিস্টানদের মাঝে এর প্রবণতটা একটু বেশি ছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, "لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ، يُحَذِّرُ مِثْلَ مَا صَنَعُوا." "ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদের প্রতি আল্লাহ্র অভিশাপ, তারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে। (এই বলে) তারা যে (বিদ'আতী) কার্যকলাপ করতো তা থেকে তিনি সতর্ক করলেন।"[৩৯]

অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের তুলনায় মুসলমানদের সাথে খ্রিস্টানদের বসবাস ছিল বেশি। এজন্য তাদের দ্বারা প্রভাবিতও বেশি হয়েছেন। শায়খুল ইসলাম ইবন তায়মিয়া (র.) বলেন, অনেক অজ্ঞ মুসলিম খ্রিস্টানদের নিকট সম্মানিত স্থানসমূহের উদ্দেশ্যে মান্নত করে। অনেকে খ্রিস্টানদের গীর্জা যিয়ারত করতে যায় এবং তাদের পাদ্রীদের কাছ থেকে বরকত গ্রহণ করে।"[৪০] যদি আমরা কবর পূজারীদের ব্যাপারে চিন্তা করে দেখি, তাহলে এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এটি ইসলাম পূর্ব আরবে যে মূর্তিপূজার প্রবণতা ছিল তারই প্রভাবিত প্রতিফলন। সর্বপ্রথম আওলিয়াদের কবরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন শুরু করেছে মিশরের অধিবাসীরা। কবরের উপর ইটের ঘর নির্মাণ করে মাজার তৈরির চিন্তাধারাটা চলে এসেছে ফিরাউনের যুগ থেকে। যার কোনো প্রমাণ পবিত্র কুরআন ও হাদীছে নেই। যা খ্রিস্টানরাও তাদের পুণ্যবানদের কবরের উপর মাজার/ মজসিদ নির্মাণ করে পূজা করতো।[৪১]

আবূল হাসান আন-নদবী (র.) বলেন, বর্তমান আওলিয়া ও মাশায়িখদের কবরে যা চলছে, তা মূলত অমুসলিমরা তাদের 'ইবাদত খানায় এবং তাদের পুণ্যবানদের কবরে যা করে, তাদের নিকট আশ্রয় প্রর্থনা করে, তাদের নিকট সাহায্য চায় এবং নিজের বিভিন্ন প্রয়োজনের কথা কবর-মাজারের নিকট আবেদন করে ইত্যাদির আদলেই হচ্ছে।[৪২]

মোটকথা মুসলমানগণ অমুসলিমদের সাথে অধিক মেলামেশার কারণে অমুসলিমরা মুসলামানদের এলাকায় বসবাস করায় এবং অনেক অমুসলিম তাদের অপসংস্কৃতিসহ ইসলাম কবুল করায় নিদর্শনাবলির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের ফিতনা ছড়িয়ে পড়ার অন্যতম কারণ।

৫. পথভ্রষ্ট আলিমগণ

স্মৃতিবিজড়িত স্থানের ফিতনা ছড়িয়ে পড়ার অন্যতম কারণ হলো পথভ্রষ্ট আলিমগণ। তাদের কারণেই মুসলিম জাতি বড় বিপদে পতিত হয়েছে। ইবন তায়মিয়া (র.) বলেন, "এই সকল পথভ্রষ্ট আলিম রাজা-বাদশা ও সম্পদশালীদের মনজয়ের জন্যই লেখালেখি করতো এবং তাদের চাহিদা মোতাবিক গ্রন্থ রচনা করে তাদের নৈকট্য অর্জন করতো।"[৪৩]

রাফেদীদের শায়খ ইবনুন নু'মান যিনি তাদের কাছে "আল-মুফীদ" নামে প্রসিদ্ধ, তিনি "মানাসিকুল মুশাহিদ" নামক একটি বই লিখেছেন যেখানে তিনি সৃষ্টিকুলের কবর যিয়ারতকে হজ্বের সাথে তুলনা করেছেন, তিনি বলেন, "পুণ্যবানদের কবরসমূহে হজ্ব করা হবে যেভাবে বায়তুল্লাহ্‌র হজ্ব করা হয়। অথচ কা'বাই প্রথম ঘর যেটা ছাড়া অন্য কোনো কিছুর তাওয়াফ করা যাবে না। সেদিকে ছাড়া অন্য কোনো দিকে নামায পড়া যাবে না। আর এটা ছাড়া অন্য কোথাও হজ্বের নির্দেশ আল্লাহ্ তা'আলা দেননি।[৪৪] মূলত এইসব বই লেখার পেছনে তাদের হীন উদ্দেশ্য রয়েছে, তা হলো, রাজা-মন্ত্রীদের নৈকট্য অর্জন করা আর উম্মতকে পথভ্রষ্ট করা।

ইবন তায়মিয়া (র.) বলেন, "মূলত এ ভ্রান্ত মতবাদ প্রচলন করেছে এক শ্রেণির মুনাফিক ও কুফরী সম্প্রদায়। যাদের মৌলিক উদ্দেশ্য হলো, মানুষকে আল্লাহ্‌র সঠিক পথ থেকে দূরে সরিয়ে রাখা ও ইসলামকে ধ্বংস করা এবং দ্বীনের মধ্যে শিরক প্রবেশ করানো। তারা কিন্তু মসজিদকে বাদ দিয়ে কবর, মাযার, স্মৃতিবিজড়িত স্থান ইত্যাদির প্রতি বেশি সম্মান ও ভক্তি দেখায়। এ ব্যাপারে ভক্তদের নিমিত্তে অসংখ্য অকল্পনীয় ও মিথ্যা কথা রটিয়ে দেয়। এরই মাধ্যমে মানুষকে শিরকী কর্মে লিপ্ত করে দেয়। অথচ এগুলো আল্লাহ্ তা'আলা এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বিধানবহির্ভূত কর্মকাণ্ড।"[৪৫]

৬. পথভ্রষ্ট নেতাগণ

পথভ্রষ্ট নেতাগণের ভয়াবহতা সম্পর্কে কোনো সচেতন ব্যক্তি অনবগত নয়। যেমন বলা হয়, "প্রজারা তাদের রাজার স্বভাবের উপর হয়ে থাকে।"[৪৬] রাসূলুল্লাহ্ সমগ্র উম্মতকে এদের ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। ছাওবান (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীছে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, "إِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ." "নিশ্চয় আমি ভয় করছি আমার উম্মতের জন্য পথভ্রষ্ট নেতাদের ব্যাপারে।"[৪৭]

যিয়াদ ইবন হুদায়র (র.) বলেন, "قَالَ لِي عُمَرُ: «هَلْ تَعْرِفُ مَا يَهْدِمُ الْإِسْلَامَ؟» قَالَ: قُلْتُ: لَا، قَالَ: «يَهْدِمُهُ زَلَّةُ الْعَالِمِ، وَجِدَالُ الْمُنَافِقِ بِالْكِتَابِ وَحُكْمُ الْأَئِمَّةِ الْمُضِلِّينَ." "আমাকে উমর (রা.) বলেছেন, তুমি কি জান ইসলামকে কে ধ্বংস করবে? আমি বললাম, না। তিনি বলেন, আলিমের পদস্খলন, কিতাব নিয়ে মুনাফিকদের ঝগড়া এবং পথভ্রষ্ট নেতাদের শাসন।"[৪৮] যেমন সাহাবায়ে কিরামের যুগে বায়তুল মুকাদ্দাসের পাথরের উপর গম্বুজ নির্মিত করা হয়নি। ইবন তায়মিয়া (র.) বলেন, বরং এটি ছিল উন্মুক্ত অবস্থায়। পরবর্তীতে আব্দুল মালিক ইবন মরওয়ান যখন শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করেন, তখন তিনি সেই পাথরের ওপর একটি গম্বুজ নির্মাণ করেন এবং শীত-গ্রীষ্মে এর ওপর পর্দা পরিয়ে দেন। যাতে করে মানুষ বায়তুল মুকাদ্দাসের যিয়ারতের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে।[৪৯]

অন্য স্থানে তিনি বলেন, সেই সময় থেকে সেই পাথর ও বায়তুল মুকাদ্দাসের সম্মান প্রদর্শন শুরু হলো। অথচ ইতিপূর্বে মুসলমানরা এ ধরণের সম্মান প্রদর্শনের কথা জানতেনও না। এতে কোনো সন্দেহ নেই খুলাফায়ে রাশিদীন সেই পাথরের উপর গম্বুজ নির্মাণ করেননি এবং সাহাবায়ে কিরামও এর সম্মান প্রদর্শন করেননি এবং এর নিকট নামায পড়াকে বরকতও মনে করতেন না।[৫০]

শায়খ 'আহমদ 'আব্বাসী (র.) বলেন, ৬৭৮ হিজরিতে বাদশাহ নাসির মুহাম্মদ ইবন কালাবূন-এর নির্দেশে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর হুজরা মুবারকের উপর সবুজ গম্বুজ নির্মিত হয়। ইতিপূর্বে এই গম্বুজ নির্মাণ করা হয়নি। বরং মসজিদের ছাদ ও হুজরা মুবারকের ছাদের মধ্যে পার্থক্য করার জন্যে কেবল হুজরা মুবারককে কেন্দ্র করে বরাবর উপরে ছাদের উপর তিন ফুট উঁচু একটি প্রাচীরের বেষ্টনী নির্মাণ করা হয়েছিল। কিন্তু সেই যুগে এই গম্বুজ ছিল না।[৫১]

ইসলামী আইনে স্মৃতিবিজড়িত স্থানের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের বিধান ও পরিণতি

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে তার যমীনে ভ্রমণ করতে বলেছেন। তাঁর সৃষ্টি নিয়ে গবেষণা করতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং পূর্ববর্তী জাতিসমূহের পরিণতি থেকে শিক্ষাগ্রহণ করতে বলেছেন।[৫২] এ থেকে এটা উদ্দেশ্যে নয় যে, আমরা এগুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবো বরং আমরা যখন এগুলোর উপর দিয়ে অতিক্রম করবো, তখন দ্রুত অতিক্রম করার কথা বলা হয়েছে। কারণ, এগুলো অভিশপ্ত এলাকা, যদি এগুলোর মধ্যে কোনো কল্যাণ নিহিত থাকত তাহলে অবশ্যই এগুলোর প্রতি গুরুত্বারোপের কথা কুরআন ও হাদীছে বলা হত। কিন্তু এখন তার উল্টোটাই বলা হয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলা 'আদ সম্প্রদায় যে বড় বড় সুউচ্চ ঘর নির্মাণ করতো তারই প্রতি বিরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন, ﴿أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ﴾ "তোমরা কি প্রতিটি উচ্চ স্থানে স্মৃতি স্তম্ভ নির্মাণ করছো নিরর্থক? আর তোমরা প্রাসাদ নির্মাণ করছো। এই মনে করে যে, তোমরা চিরস্থায়ী হবে।"[৫৩]

ইবন কাছীর (র.) বলেন, 'আদ সম্প্রদায় তাদের শক্তি ও ধনৈশ্বর্যের নিদর্শন রূপে উঁচু উঁচু প্রসিদ্ধ পাহাড়ের উপর উঁচু উঁচু প্রাসাদ নির্মাণ করেছিল। হযরত হুদ (আ.) তাদেরকে এভাবে মাল অপচয় করতে নিষেধ করেছিলেন। কেননা, ওটা শুধু মাল অপচয় করা, সময় নষ্ট করা এবং কষ্ট উঠানো ছাড়া কিছুই ছিল না। এতে না ছিল দ্বীনের কোনো উপকার এবং না ছিল কোনো উপকার দুনিয়ার। মনে রেখ দুনিয়া তোমাদেরকে আখিরাতের কথা ভুলিয়ে দিয়েছে। তোমাদের এ মনোবাসনা নিরর্থক।[৫৪] উঁচু উঁচু প্রাসাদ নির্মাণের ক্ষেত্রে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এরকম ভর্ৎসনা! তাহলে পুণ্যবানদের নিদর্শনাবলির গুরুত্বদান ও পূজা করা কিংবা কবরের উপর মসজিদ কিংবা মাজার নির্মাণ করার উপর তিনি কতইনা অসুন্তষ্ট হবেন!? চিন্তা করা দরকার।

নিম্নে ইসলামী আইনে স্মৃতিবিজড়িত স্থানের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের বিধান এবং এর পরিণতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

সুন্নাতকে ধ্বংস করা হয়

স্মৃতিবিজড়িত স্থানের প্রতি গুরুত্বারোপের আরেকটি ধ্বংসাত্মক দিক হলো, সুন্নাতের আদর্শকে বিসর্জন দেয়া। আর এটা হলো বিদ'আতের একটি বৈশিষ্ট্য। কারণ মানুষের অন্তর যখন বিদ'আতে

ভরপুর হয়ে যায় তখন তা সুন্নাত থেকে বিমুখ হয়ে যায়।[৫৫] হাস্‌সান ইবন আতিয়্যা (র.) বলেন, "مَا ابْتَدَعَ قَوْمٌ بِدْعَةً فِي دِينِهِمْ إِلَّا نَزَعَ اللَّهُ مِنْ سُنَّتِهِمْ مِثْلَهَا." "কোনো জাতি যখন তাদের ধর্মে বিদ'আত সৃষ্টি করবে, তখনই আল্লাহ্ তা'আলা অনুরূপ পরিমাণ সুন্নাতকে তাদের থেকে উঠিয়ে নেন।"[৫৬] আর নিঃসন্দেহে যখন সুন্নাতের মৃত্যু ঘটে তখন বিদ'আত নতুন জীবন লাভ করে। যখনই মিথ্যার উপর আমল করা হয় তখন সত্যের উপর আমল পরিত্যাগ করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। অনুরূপ তার বিপরীত ব্যাপারও ঘটে থাকে। কারণ দুটি বিপরীত জিনিস এক স্থানে অবস্থান করতে পারে না।[৫৭] নিম্নে নিদর্শনগত কিছু বিদ'আতের বিবরণ তুলে ধরা হলো যেগুলোর কারণে সুন্নাত ও ওয়াজিবসমূহ ধ্বংস হয়ে যায়।

এক. কবরের আশেপাশে বসে যা করা হয় তা এবং এই জাতীয় বিদ'আত মানুষকে সুন্নাত, ওয়াজিব এমনকি ফরয থেকেও বিরত রাখে। বরং অনেকে অতিরঞ্জন করে বলে যে, কবরের উপর নিদর্শনাবলির যিয়ারত করা কা'বা শরীফের হজ্ব করার চেয়েও উত্তম। (না'উযুবিল্লাহ্।) তারা এটাও বিশ্বাস করে যে, নবী করীম ﷺ-এর কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা বাইতুল্লাহ্‌র হজ্বের চেয়ে উত্তম।[৫৮]

দুই. মর্যাদাপূর্ণ তিন মসজিদ অর্থাৎ মসজিদুল হারাম, মসজিদুন নবী ও মসজিদুল আক্‌সাকে বাদ দিয়ে মক্কা, মদীনা ও সিরিয়ার অন্যান্য কিছু পাহাড়, স্থান ও নবী এবং পুণ্যবানদের স্মৃতিবিজড়িত স্থানকে নামায, দু'আ ইত্যাদি 'ইবাদতের উদ্দেশ্যে সফর করা। এরই মাধ্যমে মর্যাদাপূর্ণ মসজিদসমূহে ফরজ ও মাসনূন ইবাদত আদায় করার হক নষ্ট হয়ে যায়।

বিদ'আতে নিপতিত করে

স্মৃতিবিজড়িত স্থানের প্রতি গুরুত্বারোপ করা, এগুলোর পুনরুজ্জীবিত করা ধর্মের মধ্যে বিদ'আত ছাড়া আর কিছু নয়। কুরআন ও সুন্নাহ্‌তে এগুলোর স্বপক্ষে কোনো দলীল নেই। সালফে-সালিহীনও এইসব কাজ করেননি। যদি এগুলো পুণ্যের কাজ হত তাহলে তারাইতো এতে অগ্রগামী হত। অথচ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, "مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ" "যে ব্যক্তি আমাদের ধর্মীয় ব্যাপারে এমন বিষয় উদ্ভাবন করে যা তাতে নেই, তা পরিত্যাজ্য।"[৫৯] অন্য বর্ণনায় এসেছে, "مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ." "যে ব্যক্তি এমন কোনো কর্ম করলো যা আমাদের নীতি ধর্মে নেই, তা প্রত্যাখ্যাত হবে।"[৬০]

জাবির (রা.) বর্ণিত হাদীছে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জুমু'আর ভাষণে বলেন, "أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ." "নিশ্চয় উত্তম বাণী হলো আল্লাহ্ তা'আলার কিতাব এবং সর্বোত্তম হিদায়াত হলো মুহাম্মদ ﷺ-এর হিদায়াত। নিকৃষ্ট বিষয় হলো বিদ'আত-(নতুন আবিস্কৃত বিষয়সমূহ)। সকল বিদ'আতই হলো পথভ্রষ্টতা।"[৬১]

যদি গারে হিরা', গারে ছাওর, নবী কারীম ﷺ-এর জন্মস্থান, দারুল আরকাম এবং বায়'আতুর রিদওয়ানের স্থানকে ইবাদত ও আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের নিয়্যতে যিয়ারত করা হয়, তাহলে তা হবে বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত। যা থেকে আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾ "তাদের কি এমন শরীক দেবতা আছে, যারা তাদের জন্যে সে ধর্ম সিদ্ধ করেছে, যার অনুমতি আল্লাহ্ দেননি?।"[৬২] উমর (রা.) আম্বিয়ারে কিরামের নিদর্শনাবলি অন্বেষণ করতে নিষেধ করেন এবং জনগণকে শিরক ও বিদ্'আত থেকে ফিরিয়ে রাখার জন্যে হুদায়বিয়ার সন্ধি যে বৃক্ষের নীচে হয়েছিল তা কেটে ফেলার নির্দেশ দিয়েছিলেন। যখন তাঁকে বলা হলো, মানুষ এর যিয়ারত ও সম্মান করে চলছে।[৬৩]

বিভিন্ন ধরণের মিথ্যার মধ্যে নিপতিত করে

স্মৃতিবিজড়িত স্থানের প্রতি গুরুত্ব দিতে গিয়ে এর অনুসারীরা বিভিন্ন ধরনের মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে। এসব ঘৃণিত মিথ্যাগুলি নিম্নরূপ:

১ম. আল্লাহ্ তা'আলা কিংবা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ব্যাপারে মিথ্যা বলা এটি জঘন্যতম মিথ্যাসমূহের অন্যতম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এধরণের মিথ্যাচার থেকে উম্মতকে সতর্ক করে বলেন, "مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ." "যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, সে যেন জাহান্নামে তার বাসস্থান নির্ধারণ করে নেয়।"[৬৪]

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বাণীর ব্যাপারে মিথ্যা বলার কয়েকটি স্বরূপ নিম্নে প্রদান করা হলো।

এক. রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কবর যিয়ারতের ব্যাপারে জালহাদীছসমূহ।

দুই. বায়তুল মাক্‌দিসের পাথরের ব্যাপারে মিথ্যা হাদীছসমূহ।

তিন. দামেস্কের উমামী জামে মসজিদের ব্যাপারে জালহাদীছসমূহ।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিদর্শনের ব্যাপারে মিথ্যা বলার উদাহরণ হলো, বর্তমান যুগে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বাল মুবারক তথা চুল এখনো সংরক্ষিত অবস্থায় বিদ্যমান আছে বলে দাবী করা অথবা কিছু পাথরের উপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পা মুবারকের চিহ্ন বিদ্যমান রয়েছে বলে দাবী করা।

২য়. রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবী বা তাবি'ঈন কিংবা অন্যান্য পুণ্যবানদের ব্যাপারে মিথ্যাচার। তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যাচারটা কখনো কথার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। যেমন, বিভিন্ন স্থানের ফযীলত সম্বলিত বর্ণনাসমূহ তাদের নামে চালিয়ে দেয়া অথবা কর্মের ক্ষেত্রে তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা বলা। যেমন বলা হয়ে থাকে যে, ইমাম শাফি'ঈ (র.) কোনো বিপদে পতিত হলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর কবরের পাশে বসে দু'আ করতেন। অতঃপর তার দু'আ কবুল করা হত।

৩য়. নিদর্শনের স্থান নির্ধারণের ব্যাপারে মিথ্যাচার। এটা বিশেষ করে কিছু সাহাবীর কবর, মসজিদ ও জন্মস্থান নির্ধারণের ব্যাপারে হয়ে থাকে। যেমন, মসজিদুল কু'। বলা হয়ে থাকে য়ে, এটাকে

মসজিদুল কু' এজন্য বলা হয়, যেহেতু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর জাতির নির্যাতন থেকে কিছুটা বিশ্রাম লাভের জন্য এখানে তার কু' তথা কুনই মুবারক রেখেছিলেন।[৬৫] আর মসজিদুর রায়াহ্: বলা হয়ে থাকে, যেই জায়গায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন তাঁর পতাকা গড়েছিলেন।[৬৬] অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জন্মস্থান নির্ধারণের ব্যাপারটাও একই।[৬৭]

৪র্থ: শার'ঈ দলীল ছাড়া কোনো স্থান হতে বরকত লাভের দাবি করা।

এর উদাহরণ হলো, কারো কারো ধারণা যে উম্মুল মু'মিনীন খাদীজা (রা.)-এর ঘর মক্কায় মসজিদুল হারামের পর অন্যান্য ঘর হতে উত্তম। আর এখানে দু'আ কবুল হয়। অনুরূপ কিছু কবর, পাহাড় ও নির্দিষ্ট মসজিদের পাশে দু'আ কবুল হওয়ার দাবী করা। অথচ এরই স্বপক্ষে কোনো দলীল নেই।

কাফিরদের সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ হয়

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, "مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ." যে কোনো জাতির সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে।[৬৮]

মূলত মুসলমানগণ অতীতে এই সব স্মৃতিবিজড়িত স্থান ও নিদর্শনাবলির দিকে ভ্রুক্ষেপ করেননি। এই ব্যাপারে তাদের অন্তরে কোনো ভাবও উদয় হয়নি। কিন্তু একসময় পাশ্চাত্যরা এই সব বিষয় নিয়ে ঘাটাঘাটি শুরু করল এবং স্মৃতিবিজড়িত স্থানের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ হলো। আর এগুলো হলো অমুসলিমদের স্বভাব ও কাজ। আমাদেরকে মুশরিকদের বিরোধিতা করতে বলা হয়েছে এবং তাদের সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ না করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। শায়খ আব্দুল আযীয ইবন বায (র.) বলেন, এগুলো ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদের কাজ। আল্লাহ্ তা'আলা এগুলো থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।[৬৯]

গোনাহ্ ও অবাধ্যতায় জড়িয়ে পড়া

স্মৃতিবিজড়িত স্থানের আরেকটি নেতিবাচক দিক হলো, গোনাহ্ ও গর্হিত কাজে নিমগ্ন হওয়া। যেমন,

এক. গম্বুজ, মাজার ইত্যাদি নির্মাণে এবং এগুলোকে উত্তম কাপড়ের গেলাফ পরিধান করা ও আলোক সজ্জায় টাকা-পয়সা অপচয় করা।

দুই. নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা ও সহাবস্থানের ফলে অনেক ফিতনার জন্ম নেয়।

তিন. কবর ও মাজারের পাশে পর্দাহীনতা ও অশ্লীলতার সয়লাব বৃদ্ধি পায়।

চার. কবরের পার্শ্বে ঢুল-তবলা বাজিয়ে ভাব গানের আসর তৈরি হয়।

পাঁচ. গাঁজা, মদের আসর তৈরি হয়।

শিরকের দিকে নিয়ে যায়

স্মৃতিবিজড়িত স্থানের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের করুণ পরিণতির অন্যতম হলো, এটি মানুষকে শিরকের দিকে নিয়ে যায়। অথচ শিরক আল্লাহ্ তাআলার নিকট সবচেয়ে বড় গুনাহ্। তিনি বলেন, ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ "নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করেন না, যে লোক তাঁর সাথে শরীক করে। তিনি ক্ষমা করেন এর নিম্ন পর্যায়ের পাপ, যার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন।"[৭০]

এটা শিরকের দিকে দুই অবস্থায় নিয়ে যায়,

প্রথম অবস্থা: এই সমস্ত স্মৃতিবিজড়িত স্থানের পাশে নামায পড়া, এগুলোকে স্পর্শ করে এদের থেকে সাহায্য প্রার্থনা করা, এটাকে বরকত ও আল্লাহ্র নৈকট্যের মাধ্যম এবং সুপারিশকার বিশ্বাস করা ইত্যাদির মাধ্যমে শিরক করা হয়। শায়খ আব্দুল আজীজ ইবন বায (র.) বলেন, উল্লিখিত পন্থায় এইসব নিদর্শনাবলিকে গুরুত্ব দেওয়া আল্লাহ্ তা'আলার সাথে শিরকের নামান্তর।[৭১]

দ্বিতীয় অবস্থা: নবী-রাসূল ও পুণ্যবানদের স্মৃতিবিজড়িত স্থানসমূহকে অতিরিক্ত সম্মান প্রদর্শন করা। মূলত পৃথিবীতে শিরকের সূচনা হয়েছে এবং মূর্তিপূজার প্রচলন ঘটেছে মৃত পুণ্যবান ব্যক্তিদের অতি সম্মান করতে গিয়ে।

ইবন জারীর তাবারী (র.) পবিত্র কুরআনের এই আয়াত ﴿وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا﴾ "তারা বলছে, তোমরা তোমাদের উপাস্যদেরকে ত্যাগ করো না এবং ত্যাগ করো না ওয়াদ, সুয়া', ইয়াগুছ, ইয়া'উক ও নাসারকে। অথচ তারা অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে"[৭২]–এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বড় বড় মুফাস্সিরদের উক্তি বর্ণনা করে বলেন, "আয়াতে উল্লেখিত **ওয়াদ, সুয়া', ইয়াগুছ, ইয়া'উক এবং নাসার** এরা সবাই পুণ্যবান, দ্বীনদার লোক ছিলেন। তাদের কিছু একনিষ্ঠ অনুসারী ছিল। যখন তাঁরা মারা গেলেন, তখন তাঁদের অনুসারীরা পরস্পর বলাবলি করলো, 'যদি আমরা এঁদের প্রতিমূর্তি তৈরি করে নিই তবে আল্লাহ্ তা'আলার 'ইবাদতে আমাদের ভাল মন বসবে এবং এঁদের প্রতিমূর্তি দেখে আমাদের 'ইবাদতের আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে। সুতরাং তারা তাই করলো। অতঃপর যখন এ লোকগুলোও মারা গেল এবং তাদের বংশধরদের আগমন ঘটলো তখন শয়তান তাদের কাছে এসে বললো, তোমাদের পূর্বপুরুষরা তো ঐ বুযুর্গ ব্যক্তিদের পূজা করতো এবং তাদের নিকট বৃষ্টি ইত্যাদির জন্যে প্রার্থনা করতো। সুতরাং তোমরাও তাই করো! তারা তখন আল্লাহ্র 'ইবাদত বাদ দিয়ে নিয়মিতভাবে ঐ মহান ব্যক্তিদের প্রতিমূর্তিগুলোর পূজা শুরু করে দিলো। এভাবে স্মৃতিবিজড়িত স্থান ও নিদর্শনাবলির মাধ্যমে শয়তান একসময় তাদের মাঝে মূর্তিপূজার প্রচলন ঘটায়।"[৭৩]

স্মৃতিবিজড়িত স্থানসমূহের ব্যাপারে কিছু প্রস্তাবনা

স্মৃতিবিজড়িত স্থানসমূহের ব্যাপারে পস্তাবনা নিম্নে আলোচনা হলো:

জ্ঞানের প্রচার ও প্রসার ঘটানো

জ্ঞানার্জনের মাহাত্ম্য ও আলিমের মর্যাদা সম্পর্কে কারো সন্দেহ নেই। আর এখানে জ্ঞান থেকে উদ্দেশ্য ধর্মীয় জ্ঞান। যে জ্ঞান অর্জন করলে একজন মুসলিম তাঁর ধর্মীয় সকল বিষয়, মু'আমালাত, 'ইবাদত ও সর্বোপরি আল্লাহর সত্ত্বা ও তাঁর গুণাবলি সম্পর্কে অবহিত হতে পারে।[৭৪]

আর জ্ঞানার্জনের একটি অবিচ্ছেদ্য দিক হলো, বৃহতাকারে এই জ্ঞানকে মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেয়া, তাদেরকে শিক্ষা দান করা। যেমন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, "خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ." "তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি যে কুরআন মাজীদ শিক্ষা করে এবং শিক্ষা দেয়।"[৭৫] অনুরূপ তিনি বিদায় হজ্বের ভাষণে বলেন, "لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ." "উপস্থিত ব্যক্তি যেন অনুপস্থিত ব্যক্তিকে আমার বাণী পৌঁছিয়ে দেয়।"[৭৬] সুতরাং আলিমদের উচিত ব্যাপকভাবে মানুষের মাঝে জ্ঞান বিস্তারের কাজ চালিয়ে যাওয়া এবং জ্ঞানকে গোপন না করা। বিশেষ করে সমাজে যখন অজ্ঞতা ও বিদ'আতী কর্মকাণ্ড ছড়িয়ে পড়ে। যেন মানুষ সত্য-মিথ্যা বুঝতে পারে এবং সঠিকভাবে তাদের প্রভুর 'ইবাদাত করতে পারে। জ্ঞানের জগতে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান হলো, ইলমুল আকীদা। কারণ এই জ্ঞান মানুষকে সঠিক আকীদা-বিশ্বাস শিক্ষা দেয়। যে আকীদা-বিশ্বাস সাহাবায়ে কিরাম ও সালফে সালেহীন পোষণ করতেন। আর এটা জানা বিষয় যে, নিদর্শনাবলির উপর গুরুত্বারোপ এক ধরণের বিদ'আত। সঠিক জ্ঞান প্রচার-প্রসারের মাধ্যমে এই ধরণের বিদ'আত দূরীভূত হয়ে যাবে ইন্‌শা'আল্লাহ্।

হক ও সঠিক পদ্ধতির প্রতি আহবান করা

স্মৃতিবিজড়িত স্থানের প্রতি গুরুত্বারোপ করার নীতি থেকে সরে আসার অন্যতম মৌলিক মাধ্যম হলো, হক ও সঠিক পদ্ধতির প্রতি আহবান করা। এই আহবানের মূলনীতি হলো সৎকাজের প্রতি আদেশ ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করা। এই জন্য নিম্নের পদ্ধতিগুলো অবলম্বন করা যায়।

১. মানুষকে সেই পথের দিশা দেওয়া যার উপর সালফে-সালিহীন ছিলেন। তাদেরকে বিদা'আত ও কুসংস্কার থেকে বিরত রাখা।

২. দা'ঈগণের উচিত এইসব নিদর্শনাবলি পুনরুজ্জীবিতকরণ ও এগুলোর প্রতি গুরুত্বারোপের যত দাবী আছে সবগুলোকে কুরআন ও সুন্নাহ্‌র অকাট্য দালীল-প্রমাণের মাধ্যমে খণ্ডন করা এবং ভয়াবহ পরিণতির বিশদ বর্ণনা দেওয়া।

৩. আলিমগণের উচিত সেইসব সন্দেহ-সংশয়কে খণ্ডন করা যেগুলোর উপর ভিত্তি করে এইসব নিদর্শনাবলির সমর্থনকারীরা এগুলোকে দলীল হিসেবে পেশ করে।

৪. যেইসব এলাকায় এই সমস্যা ব্যাপক আকার ধারণ করেছে সেখানে সার্বক্ষণিক বিশেষজ্ঞ আলিম কিংবা ছাত্রদেরকে গাইডলাইন বা উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ দেওয়া। যাতে সাধারণ মানুষদেরকে সর্বাবস্থায় সচেতন করতে পারে।

৫. সুন্দর উপযুক্ত উপদেশমূলক বিলবোর্ড ছেপে কবরস্থান, দর্শনীয় জায়গা, পাহাড় ও মসজিদের পাশে লাগিয়ে দেওয়া যেখানে বিদ'আতী কর্মকাণ্ড সংঘটিত হয়।

৬. এই বিষয়ে সমসাময়িক বিজ্ঞ আলিমদের ফাতাওয়া বই আকারে প্রকাশ করা। আর পত্রিকার লেখকদের নিকট এই বিষয়ে লেখালেখি করার আহবান জানানো।

৭. যিয়ারতকারীদের সাথে কিংবা হাজীদের সাথে যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন, যারা তাদেরকে বিভিন্ন নিদর্শনাবলি স্থানসমূহে নিয়ে যায় তাদেরকে এই বিষয়ে ফাতওয়া জানিয়ে দেয়া এবং তাদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

৮. আর এ বিষয়ে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জ্ঞানী ও কুরআন ও সুন্নাহ্‌র সঠিক অনুসরণকারী হওয়া শর্ত আরোপ করা।

স্মৃতিবিজড়িত স্থানসমূহকে চিহ্নিত করে দেওয়া

স্মৃতিবিজড়িত স্থানের প্রতি সম্মানপ্রদর্শনের মোকাবেলা করার বাস্তবসম্মত উপকারী অন্যতম মাধ্যম হলো, আম্বিয়া ও সালিহীনদেরকে কেন্দ্র করে যেসব স্থানে বিদ্'আতী কর্মকাণ্ড হয় সেগুলোকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া। এ ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বর্ণনা করেন, "مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ." "তোমাদের কেউ যদি অন্যায় কাজ দেখে, তাহলে সে যেন হাত দ্বারা এর সংশোধন করে দেয়।"[৭৭] অর্থাৎ হাতের শক্তি প্রয়োগ করে গর্হিত কাজের মোকাবেলা করা ঈমানের সর্বোচ্চ স্তর। সক্ষম থাকা সত্ত্বেও এই কাজ না করা বৈধ নয়। এ ক্ষেত্রে বানূ ছাকীফের সেই প্রতিনিধি দলের কাহিনী উল্লেখযোগ্য। যারা ইসলাম গ্রহণ করার পর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এসে আবেদন করেছিলেন যে, "লাত মূর্তিকে তিন বছর পর্যন্ত অক্ষত রাখার অনুমতি দিতে, যাতে তাদের পরিবার-পরিজন তাদের বিরুদ্ধে না যায় এবং তারাও পর্যায়ক্রমে ইসলাম গ্রহণ করে ফেলে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অনুমতি দিতে অস্বীকার করেন। এরপর একবছর চেয়েছেন তাও অনুমতি

দেননি। এমনকি একমাস চেয়েছেন তাও দেননি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুগীরা ইবন শু'বা (রা.) এবং আবু সুফিয়ান (রা.)-কে সেই মূর্তি ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ দিয়ে পাঠালেন।"[৭৮]

চিন্তা করে দেখুন বানূ ছাকীফ চেয়েছিলেন, তারা যেহেতু নতুন মুসলিম, তারা তাদের সম্প্রদায়ের প্রতিক্রিয়াকে ভয় করেছিলেন এবং মূর্তিটি ভেঙ্গে নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাঙ্গন সৃষ্টি করা হতে বিরত থাকতে চেয়েছিলেন। যাতে ধীরে ধীরে তাদেরকেও দাওয়াত দিয়ে ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করানো যায়। এতদসত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ভাল মনে করলেন, শিরকের মূল উৎপাটন করা হোক এবং তিনি তাদের তথাকথিত স্বার্থের প্রতি ভ্রুক্ষেপও করেননি। ইবনুল কায়্যিম (র.) ছাকীক গোত্রের ঘটনার উপকারিতা বলতে গিয়ে বলেন, সক্ষম থাকা সত্ত্বেও শিরক ও কুফুরের চিহ্ন অবশিষ্ট রাখা বৈধ নয়। যেহেতু এটি নিকৃষ্ট অপকর্ম। সুতরাং পূর্ণশক্তি থাকলে শিরক ও কুফরের নিদর্শন রাখা সম্পূর্ণ হারাম।[৭৯]

উপসংহার

উল্লেখিত আলোচনা হতে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, স্মৃতিবিজড়িত স্থানের প্রতি সম্মান করতে গিয়ে আমাদেরকে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। যুগে যুগে নবী-রাসূল ও ইসলামের খালীফাগণ এর বিধান সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। হযরত ইব্‌রাহীম (আ.) তাঁর জাতির মূর্তি ভেঙ্গে ফেলেছেন, তিনি বলেছিলেন, ﴿وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ﴾ "আল্লাহ্‌র কসম, যখন তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে চলে যাবে, তখন আমি তোমাদের মূর্তিগুলোর ব্যাপারে একটা ব্যবস্থা অবলম্বন করব"।[৮০] ﴿فَرَاغَ إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ﴾ "অতঃপর সে তাদের দেবালয়ে গিয়ে ঢুকল এবং বলল, তোমরা খাচ্চ না কেন? তোমাদের কি হলো যে, কথা বলছ না? অতঃপর সে প্রবল আঘাতে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল"।[৮১] হযরত মূসা (আ.) গোবৎসকে পুড়িয়ে দিয়েছিলেন, যেটাকে তাঁর উম্মতের লোকেরা আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত পূজা করত। তিনি বলেন, ﴿وَانْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا﴾ "তুমি তোমার সেই ইলাহের প্রতি লক্ষ কর, যার পূজায় তুমি রত ছিলে; আমরা ওটিক জ্বালিয়ে দিবই, অতঃপর একে বিক্ষিপ্ত করে সাগরে নিক্ষেপ করবই"।[৮২]

আর মাক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কা'বা ঘরে থাকা মূর্তিগুলোকে ভেঙ্গে দিয়েছিলেন।[৮৩] আর মদীনার 'মসজিদুদ দিরার'-কে জ্বালিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন।[৮৪] কোনো কোনো খালীফা মদের স্থানসমূহ জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। বাজারের নকল দ্রব্য ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। আর উমর

(রা.) হুদায়বিয়ায় যে গাছের নীচে 'বায়'আতুর রিদওয়ান' সংঘটিত হয়েছিল তা কেটে ফেলেছিলেন শিরকের আশঙ্কায়। এভাবে আরো অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে।

সুস্পষ্ট হলো, স্মৃতিবিজড়িত স্থানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে গিয়ে যদি ইসলামী শরীআতের কোন বিধান নষ্ট হয় তাহলে এ থেকে বিরত থাকা উচিত। তবে রাষ্ট্র যদি কেবলমাত্র পর্যটোন বা বাণিজ্যিকভাবে চিন্তা করে স্মৃতিবিজড়িত স্থানের সংরক্ষণ করে কিংবা যথাযথ মর্যাদায় বহাল রাখতে চায় তবে এতে সাধারণভাবে কোনো অসুবিধা হবে না।

তথ্যপঞ্জিঃ

১. আল-বা'আলাবাক্কী, ড. রূহী, *আল-মাওরিদ*, (বৈরূতঃ দারুল 'ইলম লিলমালা'ঈন, ৬ষ্ঠ সং, ২০০২ খ্রি), পৃ. ৩৪; Elias A. Elias & Ed. Elias, *ELIAS MODERN DICTIONARY* (Bairut: Darul jail, 1st edition, 1984), p.20।

২. মাজ্‌মা'উল লুগাতিল 'আরাবিয়্যাহ, *'আল-মু'জামুল ওয়াসীত*, খ. ১ (ভারত-দেওবন্দঃ হুসায়নিয়া কুতুবখানা, ৭ম সং, ১৯৯৬ খ্রি), পৃ. ৫।

৩. ইবন তায়মিয়া, 'আহমদ ইবন 'আব্দিল হালীম, *মাজমূ'উল ফাতাওয়া*, তাহঃ 'আনওয়ারুল বায, আমিরুল জায্‌যার, খ. ১৮ (সৌদিআরবঃ দারুল ওয়াফা, ৩য় সং, ১৪৩৬ হি), পৃ. ১১।

৪. ইবন তায়মিয়া, *মাজমূ'উল ফাতাওয়া*, খ. ২৬, পৃ. ১৪৪।

৫. আল-কুরআন, সূরাতুল 'ইস্‌রা',১৭ ঃ ৮১।

৬. সূরাতু সাবা', ৩৪ ঃ ৪৯।

৭. আল-বুখারী, মুহাম্মদ, *আস-সহীহ*, তাহঃ ড. মুস্তাফা দিব বুঘা, খ. ৪ (বৈরূতঃ দারু ইবন্ কাছীর, ৩য় সং, ১৪০৭ হি/ ১৯৮৭ খ্রি), কিতাবু তাফসীরিল কুরআন, বাবু কাওলিহি, ওয়া কুল জা'আল হাক্কু ওয়া যাহাকাল বাতিল, হা নং ৪৪৩৪, পৃ. ১৭৪৯।

৮. ইবন বায, 'আব্দুল 'আযীয, *মাজমূ'উ ফাতাওয়া ইবন বায*, ইশরাফঃ মুহাম্মদ ইবন সা'দ শুওয়াই'আর, খ. ৩ (আর-রিয়াদঃ আর-রি'আসাতুল 'আম্মা লিলবাহুছিল 'ইলমিয়্যাহ্ ওয়াল ইফতা, তাবি), পৃ. ৩৩৮-৩৩৯।

৯. ইবন তায়মিয়া, *মাজমূ'উল ফাতাওয়া*, খ. ২৭, পৃ. ১৭০-১৭১।

১০. প্রাগুক্ত, খ. ২৭, পৃ. ১৭১।

১১. ইবন তায়মিয়া, 'আহমদ, *'ইকতিদাউস সিরাতিল মুস্তাকীম*, তাহঃ নাসির আব্দুল কারীম আকল, খ. ২৩ (বৈরূতঃ দারু 'আলামিল কুতুব, ৭ম সং, ১৪১৯ হি/ ১৯৯৯ খ্রি), পৃ. ২।

১২. ইবন তায়মিয়া, *মাজমূ'উল ফাতাওয়া*, খ. ২৭, পৃ. ১৭১; ইবন বায, *মাজমূ'উ ফাতাওয়া ইবন বায*, খ. ১, পৃ. ৪০৪।

১৩. মাহমূদ শাকির, *শিবহু জাযীরাতিল 'আরব*, খ. ৪ (বৈরূতঃ দারু সাদির, ১ম সং, ১৩০৫ হি), পৃ. ১১৮৮।

১৪. ইবন খালদূন, 'আব্দুর রহমান ইবন মুহাম্মদ, *তারিখু ইবন খালদূন*, তাহঃ খালীল শাহ্‌হাদা, খ. ১ (বৈরূতঃ দারুল ফিকর, ২য় সং, ১৪০৮ হি/ ১৯৮৮ খ্রি), পৃ. ৪৩১-৪৩২।

১৫. ইনি একজন ওরিয়েন্টিলিষ্ট পাশ্চাত্য চিন্তাধারার মহানায়ক।

১৬. জারীশা, 'আলী মুহাম্মদ, *'আসালীবুল গাযবিল ফিকরী*, খ. ১ (বৈরূত: দারুত তুরাছিল 'আরবী, তাবি), পৃ. ৭৮।

১৭. মুহাম্মদ ইবন আব্দিল ওয়াহ্‌হাব, *আল-খুতাবুল মিম্বরিয়া*, তাহ: সালিহ আল-আতরাম, খ. ৩ (রিয়াদ: মাতাবি'উর রিয়াদ, তাবি), পৃ. ৮৫-৮৬।

১৮. সূরাতুন নিসা', ৪ ঃ ১৭১।

১৯. সূরাতুল মায়িদাহ্‌, ৫ ঃ ৭৭।

২০. ইমাম বুখারী তাঁর সহীহ গ্রন্থে নিম্ন নামে পরিচ্ছেদ উল্লেখ করেছেন "দ্বীনের ক্ষেত্রে মাত্রাতিরিক্ত কঠোরতা অবলম্বন, তর্ক-বিতর্কে প্রবৃত্ত হওয়া, বাড়াবাড়ি করা এবং বিদা'আত অপছন্দনীয়" কেননা, আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন, "হে কিতাবীরা! তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না এবং আল্লাহ্‌ সম্পর্কে সত্য ব্যতীত বলো না (সূরাতুন নিসা, ৪ ঃ ১৭১)। ইমাম বুখারীর দলীলকৃত আয়াতে 'আহলে কিতাব' শব্দটি ব্যাপক। যাতে ইয়াহুদী-খ্রিস্টান ব্যতীত অন্যরাও অন্তর্ভুক্ত। দ্র. 'আশূর, মুহাম্মদ আত-তাহির, *মাকাসিদুশ শারী'আহ্‌ আল-ইসলামিয়্যাহ্‌* (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ্‌, ১ম সং, ১৪০৫ হি), পৃ. ৬০।

২১. আন-নাসা'ঈ, 'আহমদ, *আস-সুনানুস সুগরা*, তাহ: ড. 'আবদুল ফাত্তাহ, খ. ৫ (হালব: মাকতাবাতুল মাতবূ'আতুল 'ইসলামিয়্যাহ্‌, ২য় সং, ১৪০৬ হি/ ১৯৮৬ খ্রি), কিতাবু মানাসিকিল হজ্ব, বাবু ইলতিকাতিল হাসা, হা নং ৩০৫৭, পৃ. ২৬৮; আল-হাকিম, মুহাম্মদ, *আল-মুস্তাদরাক 'আলাস-সহীহায়ন*, তাহ: মুস্তাফা 'আতা, খ. ১ (বৈরূত দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ্‌, ১ম সং, ১৪১১ হি/ ১৯৯০ খ্রি), হা নং ১৭১১, পৃ. ৬৩৭; ইবন হিব্বান, মুহাম্মদ, *সহীহু 'ইবন হিব্বান*, তাহ: শু'আয়ব আরনাঊত, খ. ৯ (বৈরূত: মু'আস্‌সাসাতুর রিসালাহ্‌, ২য় সং, ১৪১৪ হি/ ১৯৯৩ খ্রি), হা নং ৩৮৭১, পৃ. ১৮৩।

২২. ইবন তায়মিয়া, *মাজমূ'উল ফাতাওয়া*, খ. ১৭, পৃ. ৪৬০-৪৬১; ইবন তায়মিয়া, *আর-রাদ্দু আলাল মুনতিকীন*, খ. ১ (বৈরূত: দারুল ফিকর, তাবি), পৃ. ২৮৫।

২৩. আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ১, কিতাবুস সালাত, বাবুস সালাতি ফিল বি'আতি, হা নং ৪২৪, পৃ. ১৬৭; মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ১, কিতাবুল মাসাজিদ ওয়া মাওয়াদি'ইত সালাত, বাবুন নাহই 'আন বিনাই মাসাজিদি ফিল কুবূর, হা নং ৫২৮, পৃ. ৩৭৫।

২৪. সূরাতুন নাজ্‌ম, ৫৩ ঃ ১৯।

২৫. আত-তাবারী, মুহাম্মদ, *জামি'উল বায়ান 'আন তা'বীলি আ'ঈল কুরআন*, তাহ: 'আহ্‌মদ মুহাম্মদ শাকির, খ. ২২ (বৈরূত: মু'আস্‌সাসাতুর রিসালাহ, ১ম সং, ১৪২০ হি/ ২০০০ খ্রি), পৃ. ৫২৩।

২৬. ইবন কাছীর, 'ইসমা'ঈল, *তাফ্‌সীরুল কুরআনিল 'আজীম*, খ. ৪ (কায়রো: 'আল-মাকতাবুস সাকাফী, ১ম সং, ২০০১ খ্রি), পৃ. ২৫৩।

২৭. ইবন তায়মিয়া, *মাজমূ'উল ফাতাওয়া*, খ. ১৭, পৃ. ৪৬০-৪৬১।

২৮. ইবন কাছীর, *তাফ্‌সীরুল কুরআনিল 'আজীম*, খ. ৪, পৃ. ৪২৭; আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৪, কিতাবু তাফ্‌সীরিল কুরআন, বাবু ওয়াদ্‌দান ওয়া লা সুওয়া'আন ওয়া লা ইয়াগূছা ওয়া ইয়া'উকা, হা নং ৪৬৩৬, পৃ. ১৮৭৩।

২৯. আল-আনসারী, আব্দুল কুদ্দুস, *'আছারুল মাদীনাতিল মুনাওয়ারাহ্‌* (আল-মাদীনাতুল মুনাওয়ারাহ্‌: আল-মাকতাবাতুল 'ইলমিয়্যাহ্‌, ৪র্থ সং, ১৪০৬ হি), পৃ. ১৩১।

৩০. সূরাতু আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৬৪।
৩১. আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ১, কিতাবুল 'ইলম, বাবু মান আজাবাল ফুত্ইয়া বিইশারাতিল ইয়াদি, হা নং ৮৫, পৃ. ৪৪।
৩২. ইবনুল কায়্যিম আল-জাওযীয়্যাহ্, মুহাম্মদ ইবন আবী বকর, *'ইগাছাতুল লাহফান*, তাহ: মুহাম্মদ হামিদ ফাকী, খ. ১ (বৈরূত: দারুল মা'রিফা, ২য় সং, ১৩৯৫ হি/ ১৯৭৫ খ্রি), পৃ. ২১৪-২১৫।
৩৩. ইবনুল কায়্যিম আল-জাওযীয়্যাহ্, মুহাম্মদ, *যাদুল ম'আদ ফী হাদই খাইরিল* 'ইবাদ, খ. ৩ (বৈরূত: মু'আস-সাসাতুর রিসালাহ্, ২৭ সং, ১৪১৫ হি/ ১৯৯৪ খ্রি), পৃ. ৫০৭।
৩৪. ইবনুল জাওযী, 'আব্দুর রহমান ইবন 'আলী, *তালবীসু ইবলীস*, খ. ১ (বৈরূত: দারুল ফিকর, ১ম সং, ১৪২১ হি/ ২০০১ খ্রি), পৃ. ১২১।
৩৫. আল-কারাফী, 'আহমদ ইবন ইদরীস, *আল-ফুরূক*, তাহ: খালীল আল-মানসূর, খ. ৪ (বৈরূত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ্, ১৪১৮ হি/ ১৯৯৮ খ্রি), পৃ. ৪৪৯।
৩৬. ইবনুল কায়্যিম আল-জাওযীয়্যাহ্, *'ইগাছাতুল লাহফান*, খ. ১, পৃ. ২১৪।
৩৭. আন-নাজদী, মুহাম্মদ ইবন আব্দিল ওয়াহ্হাব, *মুখ্তাসারু সীরাতির রাসূল* (সৌদি 'আরব: ওয়াযারাতুশ শুউনুল ইসলামিয়্যাহ্, ১ম সং, ১৪১৮ হি), পৃ. ৭; আত-তামীমী, মুহাম্মদ ইবন খালীফা, *হাকূকুন নাবী 'আলা উম্মাতিহি ফী দাউইল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ্*, খ. ১ (রিয়াদ: আদ্ওয়াউস সালাফ, ১ম সং, ১৪১৮ হি/ ১৯৯৭ খ্রি), পৃ. ৪৮।
৩৮. আলুশ-শায়খ, 'আব্দুল লাতীফ ইবন 'আব্দির রহমান, *তুহ্ফাতুত তালিব ওয়াল জালীস*, খ. ১ (তাবি), পৃ. ৪৫।
৩৯. আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ১, কিতাবুস সালাত, বাবুস সালাতি ফিল বি'আতি, হা নং ৪২৫, পৃ. ১৬৮; মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ১, কিতাবুল মাসাজিদ ওয়া মাওয়াদি'ইত সালাত, বাবুন নাহ্ই 'আন বিনাই মাসাজিদি ফিল কুবূর, হা নং ৫৩১, পৃ. ৩৭৭।
৪০. ইবন্ তায়মিয়া, *মাজমূ'উল ফাতাওয়া*, খ. ২৭, পৃ. ৪৬১।
৪১. আস-সায়্যিদ 'আহমদ রিফ'আত, *আত-তুরুকুস সূফিয়্যাহ্ বাইনাস সাসা ওয়াস সিয়াসাহ্*, (তাবি), পৃ. ১২৮।
৪২. আন-নদবী, আবূল হাসান আলী আল-হাসান, *আল-কাশফ আন হাকীকাতিস সূফিয়্যাহ্*, (তাবি), পৃ. ৭৮০।
৪৩. ইবন তায়মিয়া, 'আহমদ, *আল-ইস্তিকামাহ্*, তাহ: ড. মুহাম্মদ রশাদ সালিম, খ. ১ (আল-মাদীনাতুর মুনাওয়ারাহ্: জামিয়াতুল ইমাম মুহাম্মদ ইবন সাউদ, ১ম সং, ১৪০৩ হি), পৃ. ৪৩।
৪৪. ইবন তায়মিয়া, 'আহমদ, *মিনহাজুস সুন্নাহ্ আন-নাবাবীয়্যাহ্*, তাহ: ড. মুহাম্মদ রশাদ সালিম, খ. ১ (মিসর: মু'আস্সাসাতু কুরতুবা, ১ম সং, তাবি), পৃ. ৩৪১।
৪৫. ইবন তায়মিয়া, *মাজমূ'উল ফাতাওয়া*, খ. ৪, পৃ. ৫১৭-৫১৮।
৪৬. ইবন হাজার, 'আহমদ, *ফাতহুল বারী শারহু সহীহিল বুখারী*, খ. ৭ (বৈরূত: দারুল মা'রিফা, ১৩৭৯ হি), পৃ. ১৫১; আল-খুলূতী, 'ইসমা'ঈল হাক্কী ইবন মুস্তাফা, *রূহুল বায়ান*, খ. ৩ (বৈরূত: দারুল ফিকর, তাবি), পৃ. ৪৩৯।
৪৭. আত-তিরমিযী, মুহাম্মদ, *আস-সুনান*, তাহ: 'ইবরাহীম 'আতুয়া, খ. ৪ (মিসর: মাকতাবাতু মুস্তাফা আল-বাবী আল-হালবী, ২য় সং, ১৩৯৫ হি/ ১৯৭৫ খ্রি), আবওয়াবুল ফিতান, বাবু মা জা'আ ফীল আইম্মাতিল মুদিল্লীন, হা নং ২২২৯, পৃ. ৫০৪; আবূ দাউদ, সুলায়মান, *আস-সুনান*, তাহ: শু'আয়ব আরনাউত, খ. ৬ (বৈরূত: দারুর রিসালাহ্ আল-'আলামিয়্যাহ্, ১ম সং, ১৪৩০ হি/ ২০০৯ খ্রি), কিতাবুল ফিতান, যিকরুল ফিতানি ওয়া

দালাইলিহা, হা নং ৪২৫২, পৃ. ৩০৬; আশ-শায়বানী, 'আহমদ, *মুসনাদু 'আহমদ*, তাহঃ শু'আয়ব 'আরনাউত, খ. ৩৭ (বৈরূতঃ মু'আস্‌-সাসাতুর রিসালাহ্‌, ১ম সং, ১৪২১ হি/ ২০০১ খ্রি), হা নং ২২৩৯৩, পৃ. ৭৭।

৪৮. আদ-দারামী, 'আব্দুল্লাহ্‌, *সুনানুদ দারামী*, তাহঃ হুসায়ন সালীম 'আসাদ, খ. ১ (সৌদি 'আরবঃ দারুল মুগনী, ১ম সং, ১৪১২ হি/ ২০০০ খ্রি), মুকাদ্দামা, বাবুন ফী কারাহিয়াতি আখ্‌যির রাই, হা নং ২২০, পৃ. ২৯৫।

৪৯. ইবন তায়মিয়া, *মাজমূ'উল ফাতাওয়া*, খ. ২৭, পৃ. ১২।

৫০. ইবন তায়মিয়া, *'ইকতিদাউস সিরাতিল মুস্তাকীম*, খ. ২, পৃ. ৩৪৮।

৫১. আল-'আব্বাসী, 'আহমদ ইবন 'আব্দিল হামীদ, *'উম্‌দাতুল 'আখ্‌বার ফী মাদীনাতিল মুখতার* (রিয়াদঃ মাকতাবাতুর রুশদ, ১ম সং, ১৪০২ হি), পৃ. ১২৪।

৫২. সূরাতুল 'আ'আম, ৬ ঃ ১১; সূরাতুন নাম্‌ল, ২৭ ঃ ৬৯; সূরাতুর রূত, ৩০ ঃ ৪২।

৫৩. সূরাতুশ শু'আরা', ২৬ ঃ ১২৮-১২৯।

৫৪. ইবন কাছীর, *তাফ্‌সীরুল কুরআনিল 'আজীম*, খ. ৩, পৃ. ৩৪৮।

৫৫. ইবন তায়মিয়া, *'ইকতিদাউস সিরাতিল মুস্তাকীম*, খ. ১, পৃ. ৩৮৩।

৫৬. আদ-দারামী, *সুনানুদ দারামী*, খ. ১, মুকাদ্দামা, বাবু ইত্তিবাইস্‌ সুন্নাহ্‌, হা নং ৯৯, পৃ. ২৩১।

৫৭. আস-সিকাফ, 'আলাবী ইবন আব্দির কাদির, *মুখ্‌তাসারু কিতাবিল 'ই'তিসাম*, খ. ১ (রিয়াদঃ দারুল হিজরাহ্‌, ১ম সং, ১৪১৮ হি/ ১৯৯৭ খ্রি), পৃ. ৩৩।

৫৮. ইবন তায়মিয়া, *'ইকতিদাউস সিরাতিল মুস্তাকীম*, খ. ১, পৃ. ৩৮২।

৫৯. আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ২, কিতাবুস সুলহি, বাবু ইযাস তালাহু 'আলা জুরিন, হা নং ২৫৫০, পৃ. ৯৫৯; মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ৩, কিতাবুল আকদিয়া, বাবু নাকদিল আহকামিল বাতিলাহ্‌, হা নং ১৭১৮, পৃ. ১৩৪৩।

৬০. মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ৩, কিতাবুল আকদিয়া, বাবু নাকদিল আহকামিল বাতিলাহ্‌, হা নং ১৭১৮, পৃ. ১৩৪৩।

৬১. মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ২, কিতাবুল জুমু'আতি, বাবু তাখ্‌ফীফিস সালাতি ওয়াল খুতবাতি, হা নং ৮৬৭, পৃ. ৫৯২।

৬২. সূরাতুশ শুরা. ৪২ ঃ ২১।

৬৩. আল-জুদা'ই, ড. নাসির, *আত-তাবাররুক 'আন্‌ওয়াউহু ও 'আহ্‌কামুহু* (রিয়াদঃ দারুল 'আতা, ১ম সং, ১৪২২ হি), পৃ. ৪৯০-৪৯২।

৬৪. আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ১, কিতাবুল জানাইযি, বাবু মা ইয়ুকরাহু মিনান নিয়াহাতি, হা নং ১২২৯, পৃ. ৪৩৪; মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ১, মুকাদ্দামাতুল মুসলিম, বাবু ফীত তাহযীরি মিনাল কাযিবি আলা রাসূলিল্লাহ্‌, হা নং ৩, পৃ. ১০।

৬৫. বাদীন, ড. মুহাম্মদ আহমদ, *দিরাসাত ফী আছারিল মাম্‌লাকাতিল আরাবিয়্যাহ্‌ আস-সা'উদিয়্যাহ্‌* (রিয়াদঃ দারুল ওয়াফা, ১ম সং, ১৪০১ হি), পৃ. ১০১।

৬৬. বাদীন, *দিরাসাত ফী আছারিল মাম্‌লাকাতিল আরাবিয়্যাহ্‌*, পৃ. ৯২।

৬৭. বাদীন, *দিরাসাত ফী আছারিল মাম্‌লাকাতিল আরাবিয়্যাহ্‌*, পৃ. ৯৫।

৬৮. আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, খ. ১, কিতাবুল লিবাস, বাবুন ফী লিবাসিশ শুহ্‌রাতি, হা নং ৪০৩১, পৃ. ১৪৪; আল-আযদী, মু'আম্মার ইবন আবী 'আমর রাশিদ, *জামি' মু'আম্মার ইবন রাশিদ*, তাহঃ হাবীবুর রহমান আল-'আ'জামী, খ. ১১ (পাকিস্তানঃ আল-মাজলিসুল 'ইলমী, ২য় সং, ১৪০৩ হি), হা নং ২০৯৮৬, পৃ. ৪৫৩; ইবন

আবী শায়বা, 'আব্দুল্লাহ্, *আল-মুসান্নিফ ফীল 'আহাদীছি ওয়াল 'আছার*, তাহ: কামাল ইউসুফ আল-হুত, খ. ৬ (রিয়াদ: মাকতাবাতুর রুশদ, ১ম সং, ১৪০৯ হি), হা নং ৩৩০১৬, পৃ. ৪৭১।

৬৯. ইবন বায, *মাজমূ'উ ফাতাওয়া ইবন বায*, খ. ৩, পৃ. ৩৩৮।

৭০. সূরাতুন নিসা', ৪ ঃ ৪৮, ১১৬।

৭১. ইবন বায, *মাজমূ'উ ফাতাওয়া ইবন বায*, খ. ৩, পৃ. ৩৩৬।

৭২. সূরাতু নূহ, ৭১ ঃ ২৩-২৪।

৭৩. আত-তাবারী, *জামি'উল বায়ান 'আন তা'বীলি আ'ঈল কুরআন*, খ. ২৩, পৃ. ৬৩৯।

৭৪. ইবন হাজার, *ফাতহুল বারী শারহু সাহীহিল বুখারী*, খ. ১, পৃ. ১৪১।

৭৫. আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৪, কিতাবু ফাদাইলিল কুরআন, বাবু খাইরুকুম মান তা'আল্লামাল কুর্আনা ওয়া 'আল্লামাহু, হা নং ৪৭৩৯, পৃ. ১৯১৯।

৭৬. আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ১, কিতাবুল 'ইল্ম, বাবু কাওলিন নাবী, রুব্বা মুবাল্লাগিন আও'আ মিন সামি'ইন, হা নং ৬৭, পৃ. ৩৭।

৭৭. মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ১, কিতাবুল 'ঈমান, বাবু বায়ানি কাওনিন নাহ্ই আনিল মুনকারি মিনাল ঈমান, হা নং ৪৯, পৃ. ৬৯।

৭৮. ইবন সা'আদ, মুহাম্মদ, *আত-তাবকাতুল কুব্রা*, তাহ: ইহ্সান 'আব্বাস, খ. ৫ (বৈরূত: দারু সাদির, ১ম সং, ১৯৬৮ খ্রি), পৃ. ৫৫; আত-তাবারী, মুহাম্মদ ইবন জারীর, *তারিখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ. ২ (বৈরূত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ্, ১ম সং, ১৪০৭ হি), পৃ. ১৮০।

৭৯. ইবন কায়্যিম আল-জাওযীয়্যাহ্, *যাদুল ম'আদ ফী হাদই খায়রিল* 'ইবাদ, খ. ৩, পৃ. ৫০৬।

৮০. সূরাতুল আম্বিয়া, ২১ ঃ ৫৭।

৮১. সূরাতুস সাফ্ফাত, ৩৭ ঃ ৯১-৯৩।

৮২. সূরাতু তোয়াহা, ২০ ঃ ৯৭।

৮৩. আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ২, কিতাবুল মাজালিম, বাবু হাল তুক্সারুদ দিনানুল্লাতী ফীহাল খাম্রু, হা নং ২৩৪৬, পৃ. ৮৭৬; মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ৩, কিতাবুল জিহাদি ওয়াস সিয়ার, বাবু 'ইযালাতিল 'আস্নাম মিন হাওলিল কা'বা, হা নং ১৭৮১, পৃ. ১৪০৮।

৮৪. আত-তাবারী, *জামি'উল বায়ান 'আন তা'বীলি আ'ঈল কুরআন*, খ. ১৪, পৃ. ৪৬৮; ইবন কাছীর, *তাফ্সীরুল কুরআনিল 'আজীম*, খ. ২, পৃ. ৩৮৮ ।